প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রকাশনী
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫ ডি এল রায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

দুই টাকা মাত্র

বড়দিকে

# কুত্তা

মানুষটা খর্বাকৃতির। পাকাটে চেহারা। মোটা মোটা হাড়। একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ির ফাঁকে খুদে খুদে দুটি চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে সব সময়। সে চোখের ভাষা কিছুই বোঝা যায় না। অথচ প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে কেমন একটা অহেতুক আতঙ্ক জাগে। মনে হয় লোকটা যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে, ভেতরে ভেতরে কি একটা ষড়যন্ত্র নিয়ে। এখুনি বুঝি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর, শেষ করে দেবে আমার দুনিয়াদারির খেলা। কিন্তু না—রহমৎ খাঁ সে প্রকৃতির লোক নয়, অন্তত বর্তমানে তো নয়ই।

অবশ্য এমন এককাল ছিল, যখন যেখানে সেখানে বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করেনি রহমৎ খাঁ। পৃথিবীতে এমন কোনো পাপকর্ম নেই যা করেনি। কমসে কম অন্তত তেরোটা খুনই করেছে সে নিজে। সরকারী দপ্তরে অবশ্য হিসাব আছে মাত্র একটির। অকপটে আমার সামনে বসে একান্ত গোপনে তার জেলখাটা এবং কুকীর্তির গল্প করেছে এবং সেই সব গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, রহমৎ খাঁর চওড়া কব্জির হাতের সঙ্গে মোটা মোটা নীল শিরাগুলো ফুলে উঠেছে ধীরে ধীরে, শ্লথ মাংসপেশীগুলো দুলে উঠেছে, থর্‌ থর্‌ করে, কেঁপে কেঁপে উঠেছে তার সমস্ত কাঠামোটা। বিগতদিনের উচ্ছৃঙ্খলতার নৃশংস মূর্তিটা ফিরে এসেছে আবার তার মধ্যে। সোজা হয়ে বসে রহমৎ খাঁ বলে চলেছে তার জীবনের কত কথা—করুণ, নিষ্ঠুর, নির্মম বীভৎসতার

ইতিহাস। মাঝে মাঝে তার সেই খুদে চোখ দুটিতে ঝিলিক দিয়ে গেছে এক একটা অতি ক্রূর উল্লাসের প্রতিচ্ছবি। গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত আর স্তিমিত হয়ে এসেছে সেই চোখ দুটি। একটু একটু করে ধীরে ধীরে মিইয়ে এসেছে আবার, ফিরে এসেছে বাস্তবতার মাঝে। সেকাল আর একাল! তার জীবনের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, অদ্ভুত বিস্ময়করভাবে।

রহমৎ খাঁ অতি মাত্রায় বিস্মিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে: সে কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল যে শেষ বার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর বাইরে দেখবে আকাল? জমি-জমা সামান্য যা কিছু ছিল সবই যাবে না-পাত্তা হয়ে? আর এও কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল কোনোদিন যে পেটের দায়েই কিনা শেষ পর্যন্ত তার বিবি গিয়ে নিকা বসবে ওই লাল মিঞার সাথে? তারপর অন্ধকার চোখে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোলকাতা এসে সে ভর্তি হবে দমকলের চাকরিতে? আবার কিনা সে চাকরিও যাবার পর পশ্চিম বাঙলার এক শহরে আসতে হবে তাকে সেই দমকলেরই চাকরী করতে?

তার স্তিমিতপ্রায় চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে ওঠে আবার: এমনি বদ-নসীব আমার! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে রহমৎ খাঁর। সারা দুনিয়াটাই যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে তার চোখে। রহমৎ খাঁ বলে: যদি লাগোল পাইতাম, এ্যাহোনো একবার দেইখতামনি চেইষ্টা কইরা—জমি আমার নিলেম কইরা ভোগ করে ক্যামনে?...আর বিবি? অনেক খুঁজছিলাম বাবু, কিন্তু তার কোনো পাত্তাই পাইলাম না আর। তাইতো শাদী করোন লাগলো আবার......

এমনিভাবে প্রায়ই রহমৎ অনর্গল বকে যায় তার জীবনের নানা

কথা—সুখ দুঃখ আক্ষেপের কাহিনী—সম্ভব অসম্ভব কত কীর্তি। মাঝে মাঝে তার গল্প শুনতে শুনতে রীতিমত শিউরে উঠি, ভয় লাগে। কখনো কখনো এক একবার মনে হয়, এখুনি পুলিসে ধরিয়ে দিই রহমৎ খাঁকে। একটা চালাকী পেয়েছে—একগাল চাপ-দাড়ি রেখে নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে চাকরি করা। মনে মনে ভাবি, দিই সব ফাঁস করে। কোথায় ফয়েজ আলী সর্দার আর কোথায় রহমৎ খাঁ! কিন্তু আমার সে চিন্তা কাজে পরিণত করতে পারি না কখনো। কি এক অলক্ষ্য দুর্বলতা এসে বিস্রস্ত করে দিয়ে যায় আমার চিন্তারাশি।

পশ্চিম বাঙলার এই শহরে যখন প্রথম আসি, ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হয় আমাকে। নোংরা হোটেলে আর বাজে রেস্তোরাঁয় খেয়ে কোনো মতে দিনগত পাপক্ষয় করি। ক্রমশ শরীর ভেঙে পড়ে—যা অব্যর্থ আর অনিবার্য। রহমৎ সেই সময় পঞ্চাশ ষাটজন লোক নিয়ে একটা মেস করে। মেসের মেম্বাররা সকলেই তার সগোত্র অর্থাৎ বাঙালী 'ফায়ারম্যান'। অধিকাংশই পূর্ব বঙ্গের। অবশেষে একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি: রহমৎ, তোমার মেসে আমাকে নেবে?

শুনে রহমৎ বিস্মিত হয়ে যায়: হে কী কন্ বাবু?

—হাঁ রহমৎ, যেখানে সেখানে খেয়ে আর শরীর টিকছে না। তোমার ওখানে যদি—

আমার কথা শেষ না হতেই রহমৎ জিজ্ঞাসা করে: আপনি খাইবেন বাবু? রহমতের খুদে খুদে চোখ দুটোয় অবিশ্বাসের হাসি দেখা দেয়, বলে: একে হিন্দু তায় আবার বায়োন। আপনি কি আর আমাগো পাক খাইবেন!

বেশ একটু জোর দিয়েই বলি: না রহমৎ, বিশ্বাস কর ওসব অত

বাচ-বিচার আমার নেই। শুধু মুসলমান কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যদি পাই, আমি যে কোনো লোকের হাতেই খেতে পারি, অবশ্য আমি খেলে যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অন্য কথা।

পান-খাওয়া কুচকুচে লাল জিভটাকে প্রায় হাতখানেক বের করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মুহূর্তের জন্য। খুদে খুদে চোখ দুটি উল্লসিত হয়ে ওঠে রহমৎ খাঁর : আমাদের অসুবিধা! হে কি কন্ বাবু? আপনারে খাওয়াইতে পারলে, হে তো আমাগোর ভাইগ্যের জোর মনে কইরবো···

সেদিন থেকেই রহমতের মেসের মেম্বার হয়ে যাই।

রহমৎ যে আমাকে কতখানি ভালবাসে সে পরিচয় দিতে হলে সাম্প্রতিক একটা ঘটনার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি এখানে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের মেসের মধ্যে গেছি। সব 'ফায়ারম্যান'দের সঙ্গেই একটু-আধটু গল্প-গুজব করছি। সেদিন কথায় কথায় হোসেন নামে একটি ছেলে আমাকে বলল : বাবু, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধ্ছে, খুব সাবধান। আপনি একা মানুষ আর আমরা সব মুছলমান। একদিন তো ছুরী বসাইলেই শ্যাষ! খুঁজ্যেও পাবে না আর কেউ আপনারে।

হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিল হোসেন। তাই আমিও আর বিশেষ গায় মাখিনি। কিন্তু দেখলাম সেদিন রহমৎ খাঁর কাণ্ডটা। কেবল বাজার করে এসে আনাজ গুছোচ্ছিল সে। তড়াক্ করে লাফ দিয়ে উঠে হোসেনের ঘাড়টা ধরে ফেলল রহমৎ। ছিট্‌কে একাকার হয়ে গেল বাজার থেকে সদ্য-আনা তরকারীগুলো।—কি কইলি তুই বাবুরে? অগ্নিশিখা লক্‌লকিয়ে উঠল যেন রহমৎ খাঁর সেই খুদে

চোখ দুটিতে : বেকুফ কোথাকার ! কি কইলি তুই ? নিমেষের মধ্যে ধাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিল হোসেনের গালের ওপর, টলতে টলতে গিয়ে পড়ল সে দেওয়ালের এক কোণে। ঘুসি বাগিয়ে আবার সেই দিকে এগিয়ে চলল রহমৎ।

তাড়াতাড়ি সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে রহমতের হাত ধরে ফেললাম : ছিঃ রহমৎ ! কি করছ ছেড়ে দাও।

একেবারে আগুনে জল পড়ল যেন : কি কয়েন বাবু ! আপনি আবার আইলেন ক্যান্ ? বেশ একটা আক্ষেপের সুর বেজে উঠল রহমতের কণ্ঠে : হুঁঃ, দিতাম আইজ শ্যাষ কইরা আল্লা-তাল্লার নাম লইয়া।

বললাম : রহমৎ, ও তো আর সত্যিই আমাকে খুন করতে আসেনি, হাসতে হাসতেই বলেছে। এতে তোমার এমন ঝট্ করে রাগ করা উচিত হয়নি।

—উচিত হয়নি ! রহমৎ খাঁর চোখ দুটো ঝল্‌সে উঠল একবার : কেন কইবে বাবু ও অমন কথা ! আর কথা নাই জগতে ?

একটু পরেই শান্ত হোল রহমৎ। বলল, বোঝলাম বাবু, সত্যিই ও খুন করবে না আপনারে। আমাগোর বাঙলা দ্যাশের এই অবস্থা। চারদিগেই হট্টগোল, খুন-খারাপি চলতে আছে। গুণ্ডারা সব ঘর পোড়াইতে আছে, লুট করতে আছে ব্যাবাক জিনিস। মানুষের ধম্ম পর্যন্ত নষ্ট করতে আছে। আর খালি তামাম্ বাঙলা দ্যাশ ক্যান্— সারা ভারতবর্ষই জইলা যাইতে আছে হিংসায়। হালার, কাণ্ডজ্ঞান আছে নি ! আপনি হিন্দু, একা মানুষ আমাগোর মইধ্যে। আর আমরা আপনার ষাইটগুণ মানুষ—মোছলমান। আপনি আমাদের মইধ্যেই য্যানো আছেন, আপনারে রইক্ষা করবার ভারই তো আমাগোর। না কি কন বাবু ?

এমন পরিস্থিতিতে চট্ করে গুছিয়ে নিয়ে কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে ভাবছি, এমন সময় রহমৎ আবার বলল : তা ছাড়া আপনারে যদি খুন করি একা পাইয়া, হেডা কি আমাগোর খুব বীরত্বের কাম হইবো ?

প্রকাশ্যে রহমৎকে শুধু বললাম : না, তাতো হবেই না। সবার কি সেই কাণ্ডজ্ঞান থাকে ! যাক্ আর কিছু বলো না তুমি ওকে।

ঘাড় নিঁচু করে রহমৎ বলল : আইচ্ছা বাবু।

মনে মনে কিন্তু সেদিন রহমৎ খাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা না করে পারিনি। কি বলে এই নিরক্ষর মানুষটি ! এতখানি বোধ বিবেচনা শক্তি যার, সে লোক জীবনে এতগুলো খুন করেছে কি করে ? কি করে হয়েছে সে অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল আর বন্য ? আর সেই বন্য আদিমতা মিলিয়ে গিয়ে একটা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে পরিণত হোল সে কবে থেকে ? কি করে ? নিদারুণ বিস্ময় জেগেছে মনে। ভক্তি হয়েছে লোকটার ওপর সত্যিই। তখনই মনে মনে লজ্জিত হয়েছি : কাকে আমি ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম পুলিসে। ছিঃ—

রাত্রের দিকে নির্জন ঘরে বসে রহমৎ আলাপ করতে আসে আমার সঙ্গে। শক্ত চোয়ালের ওপর বসানো পান-খাওয়া কালো কুচকুচে দাঁতগুলো মাড়ীর সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রহমৎ খাঁর। একগাল হেসে কুশল প্রশ্ন শুধায় : বাবু আপনার শরীলের সাইস্থ্য ভাল তো ?

জবাব দিই : হ্যাঁ রহমৎ, ভাল।

সস্তা সিগারেটের একটা নতুন প্যাকেট বের করে রহমৎ বলে : লন্ বাবু, খান।

জিজ্ঞাসা করি—তারপর রহমৎ, খবর কি ?

রহমৎ একটা সিগারেট ধরায় : আর বাবু খবর ! আইজ ছ্যাড় মাস হইল কোনো চিঠি পাই না বাড়ির। রহমৎ বলে যায় তার নতুন বিবির কথা—কোলকাতায় দমকলের চাকরী হবার কিছুদিন পর দেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছিল যাকে। তারপর বলে : বিবির লাইগ্যা ভাবি না বাবু—পোলাডার লাইগ্যাই চিন্তা। আমাগোর ছ্যাশের দিকেই তো হুনতে আছি গণ্ডগোল বাধ ছে। চিঠি দিয়া উত্তর পাইতে আছি না। বিবি ? দুই চাইর দিন না খাইয়া থাকতে পারবে, কিন্তু বাবু পোলাডা ! ছ্যাড় বছরের পোলা আমার। রহমৎ খাঁর চোখের উপর ভাসতে থাকে তার দেড় বছরের কচি শিশুর ক্ষুধাকাতর করুণ অসহায় মলিন মুখখানি। হঠাৎ একসময়ে বলে ওঠে : কই বাবু, আইজও তো চিঠি পাইলাম না ! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় রহমৎ খাঁ।

অনেক রকম সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা আশ্বাস দিই তাকে। আমার কথাগুলো সে চুপ করে শুনে যায় বটে, কিন্তু সর্বদাই কেমন ছটফটিয়ে বড়ায়। তার পোলার, তার বিবির কি হইবো ? নিয়ত এই চিন্তাই করে সে আজকাল, কেমন যেন ছন্নছাড়া অন্যমনস্কভাব। নিজের মনে নিজেই ঘুরে বেড়ায়। সব সময় একটা নিদারুন দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন তার সেই সদা চঞ্চল খুদে চোখ দুটি। কয়েকদিন রাত্রে আমার কাছে আর আসে না। দিনের বেলায়ও ক্কচিৎ দেখা পাই তার।

রাত্রে একলা ঘরে বসে বই পড়ছি বৈদ্যুতিক আলোয়। হঠাৎ একটা মানুষ এসে ঘরে ঢুকলো আমার। আচম্বিতে চক্ষু স্থির হয়ে

গেল সেইদিকে চেয়ে। উস্‌কো খুস্‌কো চুল। হাতে একখানি নগ্ন ছোরা। লোকটির চোখে মুখে একটা কালো ছায়া এবং তারই মধ্যে থেকে ঝিকিয়ে যাচ্ছে একটা জৈবিক হিংস্রতা, অদ্ভুত মূর্তিমতী এক বিভীষিকা যেন। শক্ত-মুঠোয় ধরা তার সেই ছোরাখানি ঝক্‌মক্‌ করে উঠল একবার বিজলী-বাতির শুভ্র আলোয়। ছোরা হাতে আমার দিকেই এগিয়ে এল সে।

ভয়ে, বিস্ময়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, আঁৎকে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা। পরক্ষণেই লোকটিকে চিনতে পেরে বললাম: কি করছ রহমৎ খাঁ!

জ্বলন্ত অঙ্গারের মত সেই হিংস্র চোখ দুটি নিয়ে ছোরা হাতে সদম্ভে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না রহমৎ খাঁ। কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত হাতখানা নামিয়ে নিল সে—না বাবু, ডর নাই আপনার। রহমৎ খাঁর চোখ দুটো তেমনি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করছে। বলল: বাবু, রহমৎ খাঁ কুত্তার বাচ্চা নয় যে কামড়া কামড়ি লাগাইয়া দিবে হিন্দুর সাথে। আপনারে মারার লাইগ্যা আমার ছুরীতে শান দিই নাই।

নিজের সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম: কি ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি ছোরা নিয়ে বেরিয়েছ কেন?

চকচকে ছোরাখানা আবার শক্ত করে চেপে ধরল রহমৎ: বাবু, যে হালারা .আমাগো দ্যাশের সব্বনাশ করছে, ভাইয়ের বুকে ভাই দোস্তর বুকে দোস্ত ছুরী হাঁদাইছে হেই-সব হালাগোর লাইগ্যাই ছুরীতে শান দিছি আমার। ওই হালাগো লাইগ্যাই তো আমার বিবির আমার পোলার খবর পাইতে আছি না। যদি একবার তাগো লাগোল পাইতাম বাবু, তাইলে আমার ছুরিতে শান দেওন সার্থক হইত আইজ।

এতক্ষণে স্পষ্টভাবে বুঝলাম কার ওপর রহমৎ খাঁর এই জ্বলন্ত আক্রোশ। জিজ্ঞাসা করলাম: আচ্ছা রহমৎ, এই দুর্দিন তোমার তো একার নয়, সবারই। তুমি এমন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?

রহমৎ খাঁর চোখ দুটো তখনো জ্বলছে, রাগে ফেটে পড়ছে সমস্ত মুখ, থর্ থর্ করে কাঁপছে তার শরীরের শ্লথ মাংসপেশীগুলি। বলল: আইচ্ছা বাবু, আপনি তো বড় চাকুরী করেন, আপিসের বাবু আপনি, মাইনা পান আমাগোর ডবল।—রহমৎ খাঁর আগ্নেয় দৃষ্টির উত্তাপ কমে আসছে ক্রমেই। অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হোল তাকে: আপনি হিন্দু আর আমি মোছলমান। আপনারে যদি আইজ খুন করি, আপনার চেয়ারে ঐ চাকুরিডা কি পাইবো আমি কাইল?

বললাম: তা কি করে পাবে! তুমি কি আর কেরানির চাকরী করতে পারবে আমার মত!

—তয়! ঝট্ করে সপ্তমে চড়ল আবার রহমৎ খাঁর স্বর: তয় কেন? কি স্বার্থে মোছলমান হিন্দুরে জোবাই করছে আর হিন্দুই বা মোছলমানের গলা কাটছে?

নিজে এড়িয়ে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম: আচ্ছা, তুমিই বলত রহমৎ কেন এমন হচ্ছে? আর কিই বা লাভ এতে?

কি একটু ভেবে নিয়ে কেমন যেন একটা সস্নেহ হাসল রহমৎ খাঁ! সেই চোখঝল্সানো ছোরাখানা গুঁজে ফেলল কোমরে। তারপর বলল: বাবু আমাগোর মৌলবী ছাহেবের কাছে হুন্ছি,—কোরাণ শরীফে লেখছে, পিরথিবিতে মানুষ নাহি বেশি হইয়া যাইবো। আর তহন তাগো মইধ্যে ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা এইসব হইবো খুব বেশি। আর এইসব কইম্যা যাইবে হেইদিন—যেইদিন পিরথিবীর মান্ষ্যের

সংখ্যা কইম্যা যাইবো। তাই—আমার বোধ লাগে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা চল্‌ছে মানুষ কম হইবার লাইগ্যা। আর লাভের মইধ্যে? একটা বিরক্তি ও আক্ষেপের সুরে রহমৎ বলে উঠল: কুত্তার মত কামড়া-কামড়ি কইরবো আমরা—আর ওই হালারা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসবো। এই লাভ! অথচ—

রহমৎ খাঁর চোখ-মুখের ওপর থেকে কালো ছায়াটা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সারা মুখখানা রক্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল—চোখের তারা দুটোও অদৃশ্য শত্রুর প্রতি জ্বলন্ত বিদ্বেষে চিক্ চিক্ করে নেচে উঠলো সেই সঙ্গে। সে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল: তহন আমি কইলকাতার দমকলে আলীপুর ইষ্টিসনে চাকুরী করি বাবু। হ-অ-অ, আমার বেশ মনে আছে, হেডা আছিল ফেব্রুয়ারী মাস। কইলকাতায় ঐ যে গুলী চালাইছিল—হেই মাসের কথা। ওঃ, তহন রাস্তায় বাইর হইয়া কি আনন্দই লাগছিল বাবু। যেইদিক র‍্যানে হেইদিন হিন্দু-মোছলমান এক হইয়া গ্যাছে, কত আগুনের খবর পাইয়া আমরা গেছি। ঘর-বাড়ি লরী, ট্রাক সব পুড়তা দেখ্‌ছি বাবু চক্ষের সামনে, হিন্দু-মোছলমান ভাইরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আমাগো সামনে আইয়া খাড়াইছে। তাগো কথা অমান্য করতে পারি? ফুটপাতের উপ্পুরে খাড়াইয়া খাড়াইয়া বিড়ি টানছি আর দেখ্‌ছি—সব দলের সব ঝাণ্ডা এক হইয়া গ্যাছে। মনে মনে ভাবছি—এ কি হইল! হিন্দু-মোছলমান সব এক হইয়া গেল। আহ্লাদে বুকখান্ ভইরা ওঠছে বাবু। ভাবৃছি, এবার আর চালাকী চইলবো না আমাগো সঙ্গে।

খানিক্ষণ চুপ করে রইল রহমৎ খাঁ। তার চোখ-মুখের ওপর আবার সেই কালো ছায়াটা এসে ধীরে ধীরে লেপ্‌টে গেল—যেন আরো গভীর

হয়ে। রহমৎ বলল : কিন্তু একী ! হেইসব দিন কোথায় গেল বাবু ? অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে যায় রহমৎ খাঁ।

পরদিন রাত্রে আবার আমার কাছে এল সে। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল : বাবু, আইজও তো চিঠি পাইলাম না বাড়ির ? দিন কতক ছুটি কইরা দিতে পারেননি আমার ?

রহমৎ খাঁর উদ্বিগ্ন-আকুল মুখখানা দেখে সত্যিই ব্যথিত হলাম। তার পরদিনই সাহেবকে বলে তার ছুটির ব্যবস্থা করে দিলাম দশ দিনের। যাবার সময় রহমৎ বলল : ছালাম বাবু, দোয়া-খায়ের করবেন যেন আমার পোলা-বিবিরে যাইয়া ভাল দেহি।

—কোনো চিন্তা নেই রহমৎ। আশ্বাস দিয়ে বললাম : নির্ভাবনায় চলে যাও। যেয়ে দেখবে তোমার পোলা, তোমার বিবি ভগবানের দয়ায় ভালই আছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা রহমৎ। তোমাদের দেশের খবরটা সব ভাল করে নিয়ে এসো। তোমার কাছে সব শুনবো আমি।

ভ্রু দুটো কুঞ্চিত করে রহমৎ জিজ্ঞাসা করল : ক্যান্ বাবু ?

বললাম : খবরের কাগজে তো আজকাল সব ঠিক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না,—তুমি দেখে-শুনে এলে সত্যি খবরগুলো পাওয়া যাবে। তোমার মুখে সব শুনে আমি এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ে একটা গল্প লিখবো ভাবছি। খবরের কাগজে ছাপা হবে তোমার কাছ থেকে শোনা সেই সত্যি ঘটনাগুলি।

খবরের কাগজের কথা শুনেই বোধ করি, উৎসাহদীপ্ত চোখে রহমৎ বলল : আইচ্ছা বাবু। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঈষৎ একটু হেসে বলল : আপনি যা চান বুজ্ঝি। হিন্দুগোর সংখ্যা ?

বললাম : হ্যাঁ সে কথা ঠিক। কিন্তু হিন্দু বিপদগ্রস্তের সংখ্যা যেমন চাই, তেমনি মুসলমানেরো। বুঝলে ?

কি একটু ভাবল যেন রহমৎ। তারপর সহসা আমার সামনে এগিয়ে এসে অনুনয়ের সুরে বলল : বাবু, আমার এ্যাট্টা কথা আপনার গল্পের মইধ্যে লেখবেন ?

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কি !

রহমৎ বলল : বাবু, আপনি লেখবেন যে, রহমৎ খাঁ কইছে, বাঙলা ত্মাশের ইতর-ভদ্দর গুণ্ডা, যারা ভাইয়ের বুকে ছুরী হাঁদাইছে, পাড়া পরতিবাসীর ঘর পোড়াইছে, মাইয়ালোকের উপর অত্যাচার করছে, ধম্ম নষ্ট করছে—বলতে বলতে রহমৎ খাঁর চোখ মুখে একটা ঘৃণা-মিশ্রিত অসীম বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল : তারা সব হালায় কুত্তা, কুত্তা, কুত্তা। তারা নিজেগো বিবেকের কাছে জিগাক—এ হক কথা কিনা ; তারা কুত্তার চাইতে বেশি সম্মান পাইতে পারে কি না।

চকিতে আমার একখানা হাত ধরে ফেলল রহমৎ। তার সেই খুদে চোখ দুটি টল্ টল্ করে উঠল অনুগ্রহপ্রার্থীর মত : আপনার গল্পের মইধ্যে দয়া কইরা ল্যাখবেন বাবু এই কথাডা ?

বললাম : আচ্ছা তুমি ফিরে এসো, তারপর লিখবো নিশ্চয়ই।

আমার হাত ছেড়ে তখুনি ফিরে দাঁড়াল রহমৎ : আদাব বাবু। বলেই রওনা হোল সে।

গল্প লেখার আশায় রহমৎ খাঁর প্রতীক্ষায় দিন গুনি। কিন্তু কোথায় রহমৎ খাঁ ! দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে গেল তার। কিন্তু ফিরে আসছে না এখনো। মনের গহনে টুকরো টুকরো কত কথা উঁকি মেরে যায়।···তবে কি বাড়িতে গিয়ে তার বিবি আর পোলার সংগে

দেখা হয়নি তার? তারা কি রহমৎ খাঁকে ছেড়ে চলে গেছে জীবনের মত?···না—না—না। তবে? ··· শোনা যাচ্ছে, রেল-স্টেশনের ওপর গাড়ী থেকে নামিয়েও নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের কেটে কেটে ফেলছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে খালে-বিলে, পুঁতে ফেলছে খানা-ডোবায়। আচমকা মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে: শেষকালে যাবার পথে কোনো রেল-স্টেশনের কুত্তার কবলে পড়েনি তো রহমৎ খাঁ?

# শংকর

কাজে বেরুবার জন্যে স্নান সেরে সবেমাত্র আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তেড়ীটা বাগাবো বলে, এমন সময় কে যেন ডাকল আমায় জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে।

শুনুন—

অপরিচিত ডাক। তাই বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না। চিরুণীটা হাতে নিয়ে চালিয়ে দিলাম চুলের মধ্যে।

শুনছেন—

আবার সেই গলা। কচি কণ্ঠের আওয়াজ। আরো কাছে। একেবারে জানালার সিক ধরে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেটি। বছর দশেক বয়েস। ময়লা একটা হাফ-প্যাণ্টের ওপর তার চেয়ে ময়লা আর ছেঁড়া একটা শার্ট চাপানো। ধুলোমাখা খালি পা।

'কি চাই?' এক নজর দেখে নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই।

'একটা কাজ দেবেন?'

'কি কাজ!' নিরাসক্তের মত জিজ্ঞেস করলাম।

'যা দেবেন।'

'কি কাজ তুমি জান?'

'কিছু না, এর আগে কখনো করিনি।'

হঠাৎ খেয়াল হোল, মা মাঝে মাঝে বলেন একটা ছোট ছেলের কথা। ছোট একটা ছেলে যদি বাড়ির ছেলের মত থাকে—ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, ফুট-ফরমাস দোকান বাজার করানো, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়। ঝি-চাকর যাকেই রাখা হয়, এটাসেটা চুরি করে। ছোট বাচ্চা ছেলে চুরি করলেও রয়ে সয়ে করবে। দোকান বাজার থেকে দু একটা ফুটো পয়সা এদিক ওদিক করলেও গায় লাগবে না। জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, 'পারবে তুমি এসব কাজ করতে ?'

'পারবো।'

'কি নাম তোমার ?'

'শংকর চক্রবর্তী।"

নাম শুনিয়ে চমকে দিল আমায়। ভদ্দরলোকের ছেলে! একে দিয়ে ওসব কাজ করাবো কি করে ? ভাল করে এবার তাকালাম ওর দিকে।

'তোমার বাড়ি কোথায় ?'

'বরিশাল।'

'কোথায় থাকো এখানে ?'

'ইছাপুর, উদ্বাস্তু কলোনীতে।'

'কে আছে তোমার ?'

'মা, বাবা আর দুবোন।'

'বাবা কি করেন ?'

'পুজো করেন।'

'তাহলে তুমি চাকরি করতে বেরিয়েছ কেন ?'

'বাবা পুজো করে চার আনা আট আনা পান। তাছাড়া, পুজো তো রোজ হয় না। মাসের মধ্যে ক'দিন আর খেতে পাই আমরা।'

'এখন তো তোমার পড়াশুনোর বয়েস, চাকরি কেন করবে?'

'বাবা বললেন, একটা কাজ ছাখ।'

'তাই বুঝি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

সব শুনে বুঝলাম, শংকর ভিখিরীর ছেলে নয়, অবস্থাগতিকে ভিখিরীর দশায় এসেই দাঁড়িয়েছে।

'না শংকর, তুমি ভদ্রঘরের ছেলে, তোমাকে দিয়ে ওসব কাজ আমি করাতে পারবো না। তুমি অন্য কোথাও ছাখ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শংকর। তারপর বিমর্ষ মুখখানা তুলে কি যেন বলতে চেয়েও আর বলল না আমাকে। মাথা নিচু করে ছোট্ট একটা নমস্কার করে ঘুরে দাঁড়াল। রাস্তায় নেমে চলতে লাগল ধীরে ধীরে।

বড় মায়া লাগল। জানালায় গলা বাড়িয়ে ডাকলাম পিছন থেকে, 'শংকর শোন—'

ফিরে এল সে।

'কি যেন তুমি বলতে গিয়েও বললে না তখন?'

শংকর নিরুত্তর।

'এত কথাই যখন বললে, বলই না কি বলতে চাইছিলে?'

কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল শংকর।

'আজ দু'দিন কিছু খাই নি।'

আমারো কি হোল জানি না। চোখের কোণে না এলেও, মনের কোণে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এলাম শংকরকে। খাবার এনে পেট ভরে খাওয়ালাম ওকে। দুপুরেও আমার বাড়িতে ভাত খেতে বললাম।

অনেক কথাবার্তার পর একসময় বললাম, 'আজ থেকে তুমি আমার ভাই, বুঝলে শংকর ?'

হর্ষদীপ্ত ভিজে চোখের পাতা দুটি মেলে সে তাকাল আমার দিকে।

'দাদা !'

সেদিন থেকে শংকর আমার ছোট ভাই হয়ে গেল।

পরদিন শংকরকে আসতে বললাম। ভেবে চিন্তে ওকে একটা ব্যবসায় নামানো ঠিক করলাম।

চার ডজন পেন্সিল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে বিক্রী করতে পারলে ডজন পিছু চার আনা লাভ। চার ডজনে এক টাকা।

'রোজ এক টাকা ?' হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত আনন্দ বোধ করল যেন সে।

'হ্যাঁ। চার ডজন বিক্রী করতে পারলে, এক টাকা লাভ তোমার। বাকী টাকা আমাকে দেবে। আবার মাল এনে দেবো।'

ব্যবসায় নেমে গেল শংকর। পেন্সিল বিক্রী করতে আরম্ভ করল। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হোল না প্রথম দিন। ছ'টা পেন্সিল বেচেছে—আধ ডজন। মাত্র দু'আনা লাভ। পেন্সিলের আসল দাম রেখে ঐ দু'আনার সংগে আর দু'আনা দিলাম ওর হাতে।

'চার আনা কেন ?' প্রশ্ন করল শংকর।

'নাও না, ওটা আমি দিলাম তোমায়।'

'না দাদা।' দু'আনা পয়সা ফিরিয়ে দিল আমায় সে।

বিস্মিত হয়ে ফিরিয়ে দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, 'আপনিই তো প্রথম দিন আমায় বলেছিলেন, কারো অনুগ্রহ নেওয়া সম্মানের নয়। পরিশ্রম করে পয়সা আয় করার মধ্যেই আছে বেঁচে থাকার সার্থকতা।'

অতটুকু ছেলে। তার উপর গরীব। ওর কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনবো মোটেই আশা করিনি। শংকরের শুভ বুদ্ধিতে মুগ্ধ হলাম। মনে মনে বললাম, 'সাবাস ভাই, সাবাস।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফেরি করতে হলে যে জিনিসের দরকার সেটা হচ্ছে গলার জোর আর বলার কায়দা। পরদিন শিয়ালদার মোড়ে শংকরকে মিনমিন করতে দেখে বুঝিয়ে দিলাম সেটা। আস্তে আস্তে চটপটে হয়ে উঠল, রপ্ত করে নিল ফেরি করার কায়দা। বিক্রী বাড়ল।

বিক্রী বাড়ল মানে, আধ ডজন থেকে দু'ডজনে উঠেছে প্রায় এক মাসের চেষ্টায়। অর্থাৎ আট আনা করে আয় হচ্ছে শংকরের প্রতিদিন। দু'আনা থেকে আট আনা একেবারে কম নয়। ব্যবসায় তাহলে উন্নতি করেছে বৈকি শংকর!

কিন্তু ব্যবসায় উন্নতি করলে কি হবে, সংসারে এমন কিছু উন্নতি দেখা দেয়নি ঐ আট আনা পয়সায়। কাজেই কি করে বিক্রী বাড়ানো যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শংকর। কলকাতার রাস্তায় বড় বড় মোড়ে চীৎকার করে গলা ফাটাতে লাগল, 'নাইস পেন্সিল, অনেকদিন চলবে। একটা নিয়েই দেখুন না স্যার।"

রোজ সকালে ইছাপুর থেকে আসে শংকর। আমার কাছ থেকে চার ডজন পেন্সিল নিয়ে যায়। বিকেলে বিক্রীর পয়সা জমা দিয়ে লাভের পয়সা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

শংকরের উপর আর এতটুকু অবিশ্বাস নেই আমার। কাজেই, পাইকারী দরে যে দোকান থেকে আমি ওর জন্যে পেন্সিল কিনে আনতাম রোজ, সে দোকনটা চিনিয়ে দিলাম। দোকানদারকেও বলে দিলাম। ব্যবসা ও নিজে হাতেই করুক না সবটা।

নিজেই করতে লাগল কেনা-বেচা। রোজই বিকেলে এসে বলে যায় কত বিক্রী হোল, কত লাভ হোল।

ব্যবসার কথা বাদ দিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা শংকর, তোমাদের বাড়ির কথা তো কিছু বল না ?'

'বাড়িব কথা কি আর শুনবেন দাদা,' শংকরের মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, লোক আমরা পাঁচজন। আমার দু'দিনের পয়সা জমিয়ে একদিন খিচুড়ী হয়। আবার দু'দিন উপোষ।'

'কেন, তোমার বাবা এখনো কিছু সুবিধে করতে পারেন নি ?'

'বাবার তো বুড়ো মানুষের মত শরীর। সংসারের অভাবের জন্যে চিন্তা করতে করতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। বলেন, যা দিন পড়েছে—আর বোধ হয় বাঁচাতে পারবো না তোদের। কিন্তু আমি বলেছি, আপনি ভাববেন না বাবা আমি তো বড হচ্ছি। রোজগার করতেও আরম্ভ করেছি।'

'তোমার মা কিছু বলেন না ?'

'মার বুদ্ধি বড্ড কম দাদা। না হলে কি দিনরাত বাবার সংগে ঝগড়া করে! বলে, বুড়ো মদ্দ হয়ে ছেলেমেয়েদের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পার না, লজ্জা করে না তোমার? আচ্ছা দাদা বাবার কি দোষ! তিনি তো পুজো-আচ্চার খবর নিচ্ছেনই সব সময়। যখনই পাচ্ছেন করছেনও আর কি করবেন বলুন তো ?'

আমাকে চুপ করে শুনতে দেখে শংকর আবার আরম্ভ করে। বাবা বলেন, 'আমাদের বংশে যা কেউ কোনদিন করেনি, সেই চাকরীর চেষ্টাও তো করছি। যেমন তেমন একটাও তো জুটছে না কোথাও।'

মা বলে, 'মুটেগিরিও তো করতে পার।'

বাবা চুপ করে থাকেন। তাঁকে অবাক হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলে, 'চুপ করে রইলে যে! তাতে বুঝি সম্মানে বাধে তোমার? অমন সম্মান ধুয়ে জল খাও তুমি। কাল থেকে বাছাদের পেটে একটা দানাও পড়েনি। খিদের জ্বালায় জ্বালাতন করে খাচ্ছে। এসব ঝক্কি তো আর তোমাকে পোয়াতে হয় না। তুমি মুটেগিরি না করতে পার, আমাকেই ঝিগিরি করতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

বাবার উপর মনের ঝাল মিটিয়ে শেষে এক সময় চুপ করে যায় মা। বাবা যেন কেমন বোকার মত বসে থাকেন।

বাড়ির খবর শুনিয়ে শংকর এবার তাকায় আমার মুখের দিকে।

'তাই তো শংকর, ভারী ভাবনার কথা!' শংকরদের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মত আর কোন কথা মুখে আসে না চট করে।

আমাকে একটু চিন্তান্বিত দেখে শংকর বলে, 'আপনি আর আমাদের কথা ভাববেন না দাদা। আপনাকে পেয়েছিলাম বলে তবুতো দু'দিন অন্তর হলেও দুটো খেতে পাচ্ছি', কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ছলছলে দুটি চোখ মেলে শংকর বলে, আচ্ছা আজ যাই দাদা। ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। বলেই ছোট্ট দুটো পা ফেলে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সে।

একদিন শংকর বলল, 'কাল আর রাস্তায় দাঁড়াইনি দাদা। একজনের পরামর্শমত ট্রেনে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম। চার ডজনই বিক্রী করেছি।'

খুব উৎফুল্ল দেখায় শংকরকে।

শুনে আমারও মনে আনন্দ হোল। যাক্, বেচারার সংসারে কিছু সাহায্য হবে এবার। এমনি যদি রোজ হয়, আর বোধ হয় অনাহারে
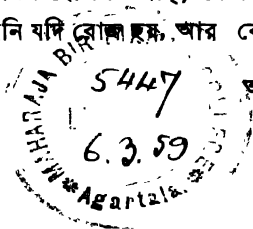
থাকতে হবে না ওদের। খুব পিঠ চাপড়ে দিলাম শংকরের! আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শংকর ডাকল, 'দাদা!'

'কি শংকর?'

'একটা কথা বলবো দাদা?'

'বল না,—এত ভাববার কি আছে?'

'ট্রেনে দেখছি, আমার মত কত ছেলে ইস্কুলে যায় আসে। আমারও ইচ্ছে করে ওদের মত ইস্কুলে পড়তে।'

'এ তো খুউব ভাল কথা শংকর। কিন্তু তোমার ব্যবসা?'

'সেই তো হয়েছে মুস্কিল দাদা', শংকর বলে, 'নাহলে, লেখাপড়া শিখে ওদের মত বড় হতে পারলে, বড় চাকরী করে কত পয়সা আনা যাবে। তখন কি আর কোন কষ্ট থাকবে আমাদের?' ছোট্ট ছেলের বুকটা একবার দুলে উঠে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'কিন্তু ভাবছি, সে আর কি করে হবে। ইস্কুলে যেতে হলে ব্যবসা ছাড়তে হবে। ব্যবসা ছাড়া মানেই সবশুদ্ধ না খেয়ে মরা।' শংকরের আশা বাস্তবে রূপায়িত করার কোনো উপায় না দেখে একটা করুণ আক্ষেপের সুর বেজে ওঠে তার কণ্ঠে।

অবাক লাগে শংকরের কথাবার্তায়। যতই মিশি ওর সংগে, বিস্মিত হয়ে যাই ওর ভাবনা চিন্তায়। শংকরের আশাকে চরিতার্থ করার মত কোন পথ দেখাতে না পেরে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত বোধ করি।

সে কিন্তু রোজই আসে। আয় তার আরো বেড়েছে। গাড়ীতে নাকি রাস্তার চেয়ে ভালই বিক্রী হয়। পাঁচ ডজন ছ'ডজন বিক্রী হচ্ছে কোনো কোনো দিন। কোনমতে হলেও এখন, দুবেলা দুটো ভাত জুটছে ওদের। শুনে মনটা একটু হালকা হয়।

কিন্তু একটা কাণ্ড শুনে আমার মাথা ঘুরে যায় একদিন। আমার অফিসের এক বন্ধু কাঁচড়াপাড়া থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে। সেই গল্প করল।

'শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পর দেখি একটি ছেলে ট্রেন ধরবার জন্যে ছুটছে। হাতে পকেটে একগাদা পেন্সিল। ট্রেনের গতির সংগে সংগে ছেলেটিরও দৌড়ের গতি বাড়ছে। ট্রেন তখন প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে রেলের ঐ লম্বা আপিসটার পাশ দিয়ে ছুটছে, গার্ডের গাড়ীর কাছ থেকে এক ভদ্রলোক ছেলেটিকে তুলবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতেই ছেলেটিও হাত এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক গাড়ীর পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় ধরেছেন ছেলেটিকে, কিন্তু তুলতে পারছেন না। তার বাঁ হাতে ভর করে ঝুলছে ছেলেটি। ওদিকে দেখি লোকো শেডের ওপাশে খালের ব্রীজটা দেখা যাচ্ছে। এইভাবে যদি ঝুলতে ঝুলতে চলে, তাহ'লে ব্রীজের লোহার ধাক্কায় গুঁড়ো হয়ে যাবে মাথাটা। সংগে সংগে হাঁ হাঁ করে উঠলাম। ভদ্রলোককে বললাম, ছেলেটির হাত ছেড়ে দিতে। তিনি হাত ছাড়তেই ধপ করে পড়ে গেল ছেলেটি। কিন্তু আশ্চর্য, মুহূর্ত মধ্যে তার পকেট থেকে পড়ে যাওয়া পেন্সিলের বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে সে ছুটতে আরম্ভ করল আবার। গাড়ী তখন ব্রীজের উপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু গাড়ী সে ধরবেই। মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল। গাড়ীর পিছন পিছন লাফাতে লাফাতে পার হয়ে এল খালের পুলটা। গাড়ীর বেগ আরো বেড়ে গেল। ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যখন বুঝতে পারল গাড়ী আর ধরতে পারবে না, তখন তার কি কান্না!'

'কি সর্বনাশ! খুব বাঁচা বেঁচে গেছে তো তাহ'লে?' আঁতকে উঠে বললাম বন্ধুকে।

'সে আর বলতে!' বন্ধু আরও বলল, 'একটু পরেই দেখি আমাদের সেই চলতি গাড়ীতে পাশের কামরা থেকে ওরই মত আর একটি ছেলে চানাচুরের থলি হাতে অদ্ভুত কায়দায় আমাদের কামরায় এসে উঠল। এরকম তো হামেশাই দেখছি। সেই চানাচুরওয়ালা ছেলেটি বলল, পেন্সিল হাতে ছেলেটিকে ও চেনে, নাম নাকি শংকর।'

বৃত্তান্ত শুনে শিউরে উঠলো আমার সমস্ত শরীর। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের ভিতরটা।

পরের দিন অবশ্য ব্যাপারটা শুনলাম শংকরের মুখেও। 'ঐ গাড়ীটাতেই যে আমার বেশি বিক্রী। ওটা ধরতে না পারলে যে বাড়িতে না খেয়ে থাকবে সবাই। তাই ছুটে ছিলাম।'

খুব ধমকে দিলাম। ধমক খেয়ে শংকর প্রতিজ্ঞা করল আর সে অমন করবে না।

কয়েকদিন পর একদিন শংকরকে খুব আনন্দিত দেখি। চোখ-মুখ দিয়ে একটা খুশির তোড় বেরুচ্ছে যেন।

'কি খবর শংকর।' জিজ্ঞাসা কবি নরম গলায়।

'এই দু'খানা বই কিনেছি দাদা', ইংরিজি আর অংকের দু'খানা নতুন বই আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে সে, 'আমাদের ওখানে এক ভদ্রলোককে ধরেছিলাম, তিনি বিনা পয়সায় রাত্তিরে আমাকে পড়াবেন বলেছেন। বাড়িতে যদি মন দিয়ে পড়তে পারি তাহলে একটু একটু করে আমাকে তিনি তৈরী করে দিতে পারবেন বলেছেন। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবো।'

যতই দিন যায়, ততই শংকরের উপর বিশ্বাস আমার গাঢ় হয়। সোনার চাঁদ ছেলে। এত যখন নিজের বড়ো হবার চেষ্টা, ও

উন্নতি করবেই একদিন। মনে মনে ভাবি আর শুভকামনা করি শংকরের।

কিন্তু পড়াশুনোতে ঠিকমত মন দিতে পারছে না ও। নতুন বই দু'খানা কেনার পর অনেক আশা করে মাকে দেখাতে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল, মা খুশিই হবেন। ছেলের পড়াশুনোয় ঝোঁক দেখে কোলে বসিয়ে আদর করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মার কথা শুনে সে হকচকিয়ে গেল।

'কোন আক্কেলে তুই বই কিনতে গেলি আমায় না জিজ্ঞাসা করে? দেখছিস্—মেয়ে দুটোর জামা ছিঁড়ে গেছে, খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। ও পয়সা দিয়ে একটা ফ্রক আনতে পারলি না?'

হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে একথার কোনো জবাব শংকর দিতে পারেনি। মনে মনে সে কেবলই ভেবেছে কি তার করা উচিত ছিল। বোনেদের ফ্রক আনাটা যেমন দরকার, তার লেখাপড়া শেখাটা যে তার চেয়েও দরকারী বেশি। সে লেখাপড়া শিখতে চায় তো ওদেরই দুঃখ ঘোচাবার জন্যে। শংকর বলে, 'এই ভাবেই মনকে বোঝালাম দাদা।'

রোজই আসে শংকর। বলে তার মনের কথা,—বড় হওয়ার ভাবনায় পেয়ে বসেছে তাকে। ব্যবসাও করবে, পড়াশুনোও করবে সেই সংগে একটু একটু করে।

হঠাৎ একদিন এল না শংকর। না আসায় মনটা ভাল লাগল না।

পরের দিনও এল না।

তার পরের দিনও।

মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। নানান রকম দুশ্চিন্তা দেখা দিল। কি হোল ওর? কেন আসছে না?

যেদিন থেকে তার সংগে আমার পরিচয়, তারপর থেকে একদিনের তরেও তো সে অনুপস্থিত হয় না!

মনটা দিনরাত ছটফট করতে লাগল শংকরের জন্যে। ওকে যে কতখানি ভালবেসে ফেলেছি তা এবার বুঝতে পারলাম। খেতে পারি না, রাত্রে ঘুমুতে পারি না ভাল করে। সব সময় ওর কচি মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আর কল্পনায় দেখি ওদের অভাবগ্রস্ত সংসারটিকে।

কি করে খবর নেওয়া যায় শংকরের? সঠিক ঠিকানাটাও জেনে রাখিনি। অসুখবিসুখ হোল নাকি ওর? ভাবতে ভাবতে একসময় মনে হয়, এ্যাকসিডেন্ট হোল না তো? সেই ট্রেনে ঝোলার ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দেখতে দেখতে এক সপ্তা কেটে গেল। শংকরের কোনো খবর নেই। রাত্রে শুতে যাবার সময় স্থির করি, সকালে উঠেই যাবো ইছাপুর। খুঁজে বার করতেই হবে শংকরকে। এত উৎকণ্ঠার ভিতর দিন কাটানো যাবে না। একটা একটা করে সব উদ্বাস্তু কলোনীগুলো ঘুরলেও কি খুঁজে পাবো না শংকরকে?

কিন্তু তার আর দরকার হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বুলোতে যাবো, এমন সময় আমার পেছন থেকে কে যেন কথা কয়ে ওঠে, 'দাদা!'

তাকিয়ে দেখি শংকর। গম্ভীর হয়ে গিয়ে যা মুখে আসে খুব একচোট ধমকানি দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন আসিসনি এতদিন?'

অপরাধীর মত শংকর বলে যায় কেন সে এই একসপ্তার মধ্যে একদিনও আসতে পারেনি। সারাদিন কেনা-বেচা করে সন্ধ্যের দিকে

আমার কাছে না এসে সোজা চলে যায় ইছাপুরে। আগের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরতে হয়। ওদের কলোনীতে একটা নাইট ইস্কুল হয়েছে, সেখানে ভর্তি হয়েছে সে। কেমন করে আসবে? এখানে আসতে গেলে যে দেরী হয়ে যেত ইস্কুলে যেতে। তাই এতদিন আসতে পারেনি। কিন্তু কপাল খারাপ তার ইস্কুল করা আর হোল না। ছেড়েই দিতে হোল শেষ পর্যন্ত।

'কেন শংকর!' বিস্মিত হযে জিজ্ঞাসা করি।

'ইস্কুলের ক'খানা বই-খাতা কেনার জন্যে বাড়িতে সব পয়সা দিতে পারিনি। তাছাড়া, এ ক'দিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে আমার আয়ও একটু কমে গেল। মা মুখ করতে লাগল, লেখাপড়া করে ছেলে লাটসাহেব হবেন। গরীবের আবার অত শখ কিসের? ভাবলাম, কি করবো? ছেড়ে দেবো? কেমন যেন একটা জেদ হয়েছিল আমার। না, আমি পড়বোই। মা বুঝচে না, এখন একটু কষ্ট হলেও, পরে লেখাপড়া শিখে যখন অনেক টাকা এনে দেবো হাতে—তখন বুঝবে। ততদিন বকা-ঝকা যাই করুক আমি শুনবো না মার কথা। কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল ও। ওর মুখের ওপর গভীর বিষাদের ছায়া।

'কিন্তু—কি শংকর?'

'আপনার কাছে বলতে লজ্জা কি দাদা, কাল বাড়ি ফিরে দেখি মা নেই।'

'সে কি শংকর! মা নেই! মানে?' শুনবার জন্যে কৌতূহল বাড়িয়ে দেয় ও।

'বোনেরা কিছু বলতে পারল না। বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোনো জবাব পেলাম না। তিনি কাঠ হয়ে বসে রইলেন। কেমন

একটা ভয় লাগল মনে। মাতো এ সময় একা একা কোথাও যায় না। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, বলুন শীগগীর মা কোথায়? আমার পীড়াপিড়িতে আস্তে আস্তে বাবা যা বললেন তা শোনার পর পড়াশুনোর কথা মন থেকে মুছে ফেলতেই হোল।'

'কি এমন করলেন তোমার মা, যার জন্যে তোমার পড়াশুনা ছাড়তে হোল?'

'মা যা করেছিল তা আর কি শুনবেন। রাত্তির করে বাড়ি ফিরলে, তার জন্যে খুব কষে বকে দিলাম। আর বললাম, লেখাপড়া না হয় নাই করবো, আগের মতই মন দেবো ব্যবসায়। তুমি জেনো, তোমার শংকর এত বোকা নয়। পয়সার জন্যে সে কিছুতেই তোমায় এত ছোট হতে দেবে না।'

ওর পেচানো কথায় রাগ চড়ে গেল আমার। এবার রীতিমত ধমক দিয়ে বললাম, 'সোজা করেই বল না কি করেছেন তোমার মা?'

'কি করেছেন?' বলতে গিয়ে একটা রুদ্ধ বেদনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ওর ছোট্ট দেহটা। এতক্ষণ বেশ সহজভাবেই বলে যাচ্ছিল। কিন্তু আর যেন কথা বেরুতে চায় না মুখ দিয়ে। তবুও অতিকষ্টে সে বলল, 'আমি লেখাপড়া করতে যাওযায় আয়ে যে ঘাটতি আরম্ভ হোল', বলতে বলতে বাঁধভাঙ্গা অশ্রু নেমে এল ওর দু'চোখ ভাসিয়ে, 'সংসারের সেই অভাব মেটাতে বাবার সংগে ঝগড়া করে মা কোথায় যেন ঝিয়ের চাকরী নিয়েছে।'

# অভিমন্যু

তিন বন্ধু আমরা, প্রায় একাত্মা বললেও চলে। বড় রামচন্দ্র—মেজ আমি শ্রীমাখনচন্দ্র আর সেজোর নাম হচ্ছে রতন।

ওগুলো আমাদের আসল নাম হলে কি হবে, রাম কিন্তু আমাকে লক্ষ্মণ বলে ডাকে,—অনুরাগের উত্তাপে মাখন গলে গিয়ে লক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। আর আদর করে রতনের নাম দিয়েছে হনুমান। সে আমাদের দুজনেরই খুব আজ্ঞাবহ। এত বড় একটা অবজেক্‌শনেব্‌ল কথা ব্যবহার করা সত্বেও রতন কিন্তু রাগ করে না মোটেই। এইখানেই তো বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য। কোনো কিছুতেই রাগারাগি বা মন কষাকষি কখনো হয় না আমাদের মধ্যে। এক কথায় সুখী বন্ধুত্রয়।

রামের বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারী সে। ভগবানের কৃপায় তিন বছরের মধ্যেই তিনটি সন্তানের বাপ হবার সৌভাগ্যও হয়েছে তার।

এক শেয়ালের ল্যাজ কাটা গেছে তো সব শেয়ালেরই কাটো! রামের সে কর্তব্যজ্ঞান প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই, যথারীতি চেষ্টা করে চলেছে লক্ষ্মণের ল্যাজ কাটবার। সব দিক দিয়ে মতে মিললেও—এইখানটায়ই লক্ষ্মণ যা একটু বেয়াড়া। কিছুতেই রাজী করাতে পারে নি তাকে। মশাই—আয় করি যা, তা দিয়ে নিজের বাসা খরচা, ছোট কলেজী-ভাইয়ের হোস্টেলের খরচা, আর বাড়িতে মায়ের জন্যে মাসোহারা পাঠিয়ে আর এমন কিছু থাকে না যাতে করে আমি বিয়ে করে ভদ্রভাবে স্বচ্ছন্দ-সংসার করতে পারি। বিয়ে

করে যদি নতুন বউ নিয়ে একটু সাধ-আহ্লাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে সচ্ছল জীবন-যাপন করতে না পারি—তবে তেমন বিয়ের কি লাভ? আমার মতে যদ্দিন তেমন সামর্থ্য না হয় তদ্দিন বিয়ের কথা ভাবাও উচিৎ নয়। বিয়ের পর যদি কেরানীদের মত একগাদা লেণ্ডি গেণ্ডি নিয়ে ভুগতে হয় জীবনভোর—সে জীবনের সার্থকতা কোথায়! অভাব অনটনের ভয়াবহতা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তার চেয়ে বিয়ে নাই কল্লাম! মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে?

মহাভারত অশুদ্ধ না হলেও রামের বাসনা অসিদ্ধ থেকে যায়। সে বোঝায়, জীবনের আসল সময়টাই যদি হেলা-ফেলায় কাটিয়ে দাও ভাই তাহলে যে জীবনটাকে বুঝতে পারবে না কোনোদিন। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, হয় আজ—না হয় দুদিন পরে। যুক্তি দিয়ে আরো কত কথা বলে। ভবি কিন্তু আমি ভুলবার নই। আমার আইডিওলজি অটল।

রতন আমার ছোট। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করেছে সে আমাদের দুজনের চেয়ে বেশি। অল্প বয়সে নিজের অধ্যবসায়ের গুণে একটা ভাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হতে পেরেছে। সে ডাকে আমায় মাখনদা বলে। ভালবাসার সংগে ভক্তি করে ঠিক বড় ভাইয়ের মত। রতন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমার বিয়ে না হলে ও-ও বিয়ে করবে না। কত বুঝিয়েছি কিন্তু শুনবে না আমার কথা কিছুতেই। ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ওর। রাম কিন্তু ঠাট্টা করে: রামায়ণে কি হনুমানের বিয়ের কথা কোথাও বলেছেন বাল্মীকি?

রাম্ থাকে শ্যামবাজারে।

আমি পার্কসার্কাস।

আর রতনের বাড়ি হচ্ছে হুগলীতে। ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে সে।

প্রতি রোববারই আমরা একত্রে মিলিত হই এক একজনের বাড়িতে। বেশ স্ফূর্তিতেই সরগরম হয়ে ওঠে রোববারগুলো। অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু আমরা।

* * *

সেদিন ১লা মে। মে-ডের একটা মিটিং-এ যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় রতনের আবির্ভাব হোল। খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব।

—মাখনদা! আরম্ভ করল রতন: কোনো কথা মানব না কিন্তু আপনার—আমার একটা কথা না রাখলে।

—কি ব্যাপার! বলেই ফেলো না! এমন হন্তদন্ত ভাব কেন?

রতনের চেহারা আজ একটু অন্য ধরনের দেখি। ভিতরে ভিতরে চল্‌কে চল্‌কে উঠ্‌ছে যেন। কথা অবশ্য একটু তাড়াতাড়ি বলাই ওর স্বভাব। তাই আর ভনিতা না করেই তড়বড়িয়ে ওঠে: আপনাকে বিয়ে করতে হবে—বুঝলেন? হ্যাঁ—বিয়ে! ঘাবড়াচ্ছেন না কি? ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই আমি মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি। না বলতে পারবেন না, আমি কোনো কথাই শুনব না। আপনাকে দেখাবার জন্যে মেয়েটিকে নিয়ে আসছি আপনার আপিসে আসছে বেস্পতিবার।

অবাক হয়ে যাই ওর কথা শুনে। ওকী প্রলাপ বকতে শুরু করল?

কথার পর কিন্তু কথার খই ফুটতে থাকে রতনের মুখে: অপছন্দ আপনার হবে না, কিছুতেই হবে না, হতেই পারে না। আমি হলপ করে বলতে পারি এ কথা। সওয়া পাঁচ ফুট লম্বা—দোহারা চেহারা—আর গায়ের রঙ? যেন ফেটে পড়ছে একেবারে! গ্র্যাণ্ড নীট ফিগার। চলনে বলনে কোথাও দেমাক পাবেন না এতটুকু অথচ ইণ্টার-মিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছে। কথায় বার্তায় কী মিষ্টি! সত্যি বলছি মাখনদা,

এমন একটা মেয়ে হাতছাড়া করা যাবে না। আপনার পছন্দ তো জানি আমি—ঠিক আপনার রুচিমাফিক হবে। বলুন—না বলবেন না?

—কি যে বল রতন! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এখনো তো আমার বিয়ে করার সময় আসেনি, আমার ইচ্ছা তো তুমি জান। তার চেয়ে এক কাজ কর তুমিই বরং বিয়ে করে ফেল।

চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বলে রতন: ছিঃ ছিঃ, আমি কি বিয়ে করতে পারি তাকে—সে আমার বোনের মত। আমি যে প্রথমেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছি তাকে এবং ধরে নিয়েছি আমার নিশ্চিত বৌদি বলেই।

কৌতূহলী মনে প্রশ্ন করি: আচ্ছা ফট্ করে এমন একটা বৌদি জোগাড় করলে কোত্থেকে বলতো?

—বলবার জন্যেই তো এসেছি। চোখ মুখ রতনের উজ্জ্বলতায় ভরে উঠল: শুনুন তাহলে। ঝর্ণার কথা মনে আছে আপনার? যে আমার ছোট বোন রেবা-দীপুকে পডাতো? সেই যে চেষ্টা করে টেলিফোনে চাকরা করে দিয়েছিলাম তার, মনে আছে তো! এ মেয়েটি সেই ঝর্ণারই ছেলেবেলার বন্ধু—কলেজ পর্যন্ত একসংগেই পডা শুনা করেছে ওরা। হঠাৎ ঝর্ণা আমার আপিসে মেয়েটিকে নিয়ে এসে উপস্থিত। ওকে একটা চাকরি করে দিতে হবে—টেলিফোন কিংবা যেখানেই হোক। মেয়েটিকে দেখে এবং ওর সংগে কথা বলে আমার এত ভাল লেগেছে যে, এমন একটা মেয়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছে করছিল ঝর্ণাকেই একটা চুমু খেয়েনি।···হাসছেন কেন? ভাবছেন আমি পাগলামি করছি—না? তা কিন্তু মোটেই নয়। মেয়েটিকে দেখে তখুনি আমি ঠিক করে ফেলেছি যে এমন একটা মেয়েকে চাকরি করতে দিয়ে নষ্ট হতে দেওয়া চলে না—একে আমার বৌদিরূপে পেতেই

হবে। তাই আবার যাতে আমার কাছে আসে সেজন্য কাল আসতে বলে দিয়েছি—ওর চাকরির চেষ্টা করবো বলে। এবং বলে দিয়েছি আমার এক বন্ধু আছেন মাখনদা তার কাছে নিয়ে যাবো। তিনি চেষ্টা করলেই অনায়াসে তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারবেন। অনেক বড় বড় লোকের সংগে তাঁর জানাশোনা আছে, খাতির আছে কত সাহেব স্থবোর সংগেও। অতএব সে আসছে আপনি দেখছেন। বুঝলেন? আপনাকে দেখাবার কেমন মতলবখানা এঁটেছি বলুন তো?

—তা-তো ভালই বুদ্ধি করেছ দেখছি। কিন্তু আমি তো ভাই এখন—

—ও কিন্তু টিন্তু শুনছি না। বিয়ে এখন না করেন যখন আপনার সময় হবে তখনই করবেন না হয়। এনগেজমেণ্টটা হয়ে থাকতে দোষ কি? বলতে বলতে রতন আমার হাত দুটো চেপে ধরে। ছেলেমানুষী আব্দারের আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে ওঠে ওর গলার স্বর: লক্ষ্মী দাদা, না করবেন না আপনি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখবার সম্মতি না দিয়ে পারি না।

নির্দিষ্ট দিনে আমার আপিস-চেম্বারে মেয়েটিকে রতন পৌছে দিয়ে যায় বেলা দুটোয়। বলে যায়, এসে আবার নিয়ে যাবে রতনের আপিসের পর। কারণ মেয়েটি থাকে চুঁচড়োয়—এক সংগে এক ট্রেনেই ফিরবে ওরা। নিয়ে যাবার সময় কিছু জিজ্ঞাসা না করে শুধু মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে চলে যায় রতন। তখন বাজে প্রায় ছটা।

পরদিন সাগ্রহে মতামত জানতে এসেছে আমার: কি মাখনদা, কেমন দেখলেন—বলুন! বলার ভঙ্গীটা এমন যেন আমার পছন্দ হয়েই আছে শুধু সেই কথাটাই শুনতে এসেছে।

বললাম : মেয়ে ত খারাপ নয় ভাই, খাসা মেয়ে। সবই ভাল, তবে কি জান, মুখের বাঁপাশে বসন্তের দাগ কটি যেন বেশ প্রমিনেন্ট, দাঁতগুলো একটু বড়-বড়, ঠোঁটটাও যেন কালো মনে হোল আর বিশেষ কিছু না—নাকটা যেন কেমন—বড্ডো টেরচা। নাক আর চোখই হচ্ছে মুখের সৌন্দর্য।

—কী বললেন? নাকটা খারাপ? বেশ খাপ্পা হয়ে উঠল রতন আমার ওপর। যেন মারে আর কী : বলি, আপনি বিয়ে করবেন কি নাকটাকে না মেয়েটাকে? কোথায় দেখবেন মেয়েটির স্বভাব, কথাবার্তা, এডুকেশন, কালচার—তা নয়, বলেন কিনা নাক খারাপ, চোখ খারাপ। ও খারাপ খারাপই নয়, বুঝলেন!

—তোমার কথা ঠিকই। তবে কি জান—অমনি নাক বাঁকা-বাঁকা ছেলেপুলে হবে যখন?

—তা কেন হতে যাবে? আপনার নাক তো কত সুন্দর।

—বউ যাই হোক ভাই—ছেলেপুলেগুলো যে নাকবোঁচা নাকফ্যাঁটা হবে সে আমি কল্পনাও করতে পারি না। তুমি আমায় ভালই বল আর মন্দই বল।

—ধন্যি আপনার যুক্তি! অত খুঁতখুঁতে মন হলে জীবনে আপনার মেয়ে জুটবে না কখনো। ওসব কোনো কথা আমি শুনবো না। এ বিয়ে আপনাকে করতেই হবে। এই পর্যন্ত বলে সেদিনকার মত চলে গেল রতন।

৪ঠা মের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে আমি বিয়ে করছি মেয়েটিকে। মেয়েটির নাম উত্তরা। বালীগঞ্জ থেকে বেলগাছিয়া, ডায়মণ্ডহারবার থেকে নৈহাটি, ক'লকাতা থেকে হুগলী অর্থাৎ সোজা কথায় উত্তর-

দক্ষিণ-পুব-পশ্চিমে রতনের জানাশুনা বন্ধুবান্ধব যার সঙ্গেই আমার দেখা হয়—কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ খুশিতে আমার পিঠ চাপড়াবার উপক্রম করে, কেউ-বা সরাসরি কন্‌গ্রাচুলেট করতেই আসে। এমনি ছেলেমানুষ, সবাইকে বলে বেড়িয়েছে যে মাখনদার সংগে উত্তরার বিয়ের ঠিক করেছি আমি। অথচ আমি জানি যে উত্তরার সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি ওর। আর হবেই বা কী করে? মেয়েটি এসেছে তো মাত্র কয়েকদিন হোল—চাকরির কথাই তো হয়েছে খালি।

৭ই মে দুপুরে রতন আমার বাসায় এসে হাজির—প্রায় ঝোড়ো কাকের মত চেহারা। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি: কি ব্যাপার হে! আজ জেনারেল ষ্ট্রাইকের দিন তুমি হুগলী থেকে ক'লকাতায় এলে কী করে? ট্রেনের চাকা তো ঘুরচে না!

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়—বুঝলেন মাখনদা? একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে রতন, সাইকেলে এসেছি।—কেন জানেন? পাকপাড়ায় ঝর্ণার বাড়িতে যাবো বলে। শুনলাম উত্তরা এসেছে ওর বাড়িতে। এখন দিনকতক ওখানেই থাকবে। ঝর্ণার ওখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে বলে। তাই ভাবলাম, আজ ঝর্ণারও ছুটি নিশ্চয়, বাড়িতেই থাকবে। ওর বাড়িতে গিয়ে উত্তরার সংগে একটু ঘনিষ্ঠ হতে হবে। এমন ঘনিষ্ঠ হতে হবে যে আমি যা বলবো তাই শুনবে। তখন চট্ করে আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাবটা করে ফেলবো। না-তো আর বলতে পারবে না! অবশ্য হাতে রাখবার জন্যে চাকরি একটা করে দিতে হবে, অন্য কোথাও না হয় আমার অফিসেই প্রোভাইড করে নেবো। যদ্দিন বিয়ে না হয় তদ্দিন তো চাকরি করুক! কী বলেন?

রতনের বুদ্ধির প্রখরতায় অবাক না হয়ে পারি না। মুগ্ধ-বিস্ময়ে ওকে দেখতে ইচ্ছে করে খালি। আপনারাই বলুন, এমন উৎসাহী বন্ধু মেলে আজকালকার দিনে ?

উত্তরার আমার সংগে বিয়ে দেবে বলে অক্লান্ত পরিশ্রম আর ঐকান্তিক চেষ্টা করে চলেছে। আমার বাড়ির তৈরী খাবার উপেক্ষা করে ঝর্ণার বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করল। বিকেলে ঝর্ণার সাথে উত্তরাকে নিয়ে লেকে সিনেমায় ঘুরে এল। পরের দিন আমার কাছে এসে রিপোর্ট দিল রতন: আর দেখতে হবে না মাখনদা, একেবারে বশ করে ফেলেছি—এবার বললেই রাজী হয়ে যাবে বলে মনে হচ্চে। উত্তরা চিংড়ীর কালিয়া রান্না করে খাওয়ালো রাত্রে—কিছুতেই আসতে দিল না। কি আর করবো, থেকেই গেলাম ওখানে রাতটা। কি চমৎকার রান্না ওর! শুধু কি তাই! টেলারিং-এও শুনলাম কম যায় না, দিনে কমসে কম দশটা করে ব্লাউজ সেলাই করতে পারে। ফ্রক, সায়া, বডিস ছোট ছেলে মেয়েদের শার্ট—কি না জানে! তারপর হাতের সেলাইও নাকি খুব ভাল জানে। নিজে কি বলতে চায়! এসব ঝর্ণার মুখ থেকেই শুনলাম। আবার গানও জানে, রেডিওআর্টিস্ট হবার খুব আগ্রহ। আর কী চান ?

…ভাই অত ভাল তো আমি চাই না। তুমিই বরং—

—ছিঃ অমন কথা যদি বলেন, আপনার সংগে বন্ধুত্ব আমার শেষ হয়ে যাবে। জানেন, আমার সঙ্গে মিশে উত্তরা এটা বুঝেচে. যে আমি ওকে আমার বন্ধুর সাথেই বিয়ে দিতে চাই—আমার যে ওর-ওপর নজর নেই, সেটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছে। তবে আপনার সাথেই যে বিয়ে দিতে চাই সেটাও বুঝতে দিইনি। আর এও বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমি ঠিক বোনের মতই দেখি ওকে।

—বেশ, বেশ। খুব ভাল কথা। সাবাস তোমার বুদ্ধি।

রামের সঙ্গে কিন্তু রতনের এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো কথাই হয়নি। উত্তরার ব্যাপার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে আলাদা করে রামের সঙ্গে দেখা করবার সময়ই করে উঠতে পারছে না। রাম অফিস-শেষে রোজই আমার কাছে আসে। রতনের পাগলামির খবর আমিই সব শোনাই রামকে। রাম আমার চেয়েও কম কথা বলে। কিন্তু শোনে বেশি আর হাসে অল্প অল্প। রামের স্বভাবই ঐ রকম।

রামকে না বললেও রাণু বৌদিকে ( রামের স্ত্রী ) কিন্তু এরই মধ্যে গিয়ে শুনিয়ে এসেছে রতন এ সুখবরটা—উত্তরার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি মাখনদার।

তারপর আরো প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। অতএব বুঝতেই পারছেন করিৎকর্মা রতন উত্তরার সঙ্গে আরো কত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে উত্তরাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তিনদিন—রতনের জানাশুনা এক অফিসার আছে, তাকে দিয়ে একটু ইনফ্লুয়েন্স করাবার জন্যে। একদিন হুগলীতে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে নেমন্তন্ন করে—মা-ভাইবোনেদের মাখনদার বৌকে দেখাবার জন্যে। তারা নাকি দেখে সবাই খুশি। বলেছে আমার মাকেও একদিন দেখাবার বন্দোবস্ত করবে। একেবারে পাকাপাকি কাজ করতে চায় ও। বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হলে কি হবে বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অনেক ঝুনো। এ কথা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে আজকাল—আমাকেও শুনিয়ে গেছে একদিন।

সত্যিই তো! আমরা হলে কি আর ওর মত এমন ভাবে ম্যানিপুলেট

করতে পারতাম সবদিক? পারতাম কি দেশব্যাপী জেনারেল ষ্ট্রাইকের দিন হুগলী থেকে পাকপাড়া পর্যন্ত সাইকেল ঠেঙিয়ে এসে উত্তরাকে লেক সিনেমায় নিয়ে যেতে?

গত তিন চার দিন দেখছি কি যেন হয়েছে রতনের। দেখা পাচ্ছি রোজই, কিন্তু কথা পাচ্ছি কম। মনে হচ্ছে সব কথা যেন আর বলছে না আগের মত। তবে কি শেষ পর্যন্ত ও রাজী করাতে পারলো না উত্তরাকে? ব্যর্থ হয়ে গেল ওর চেষ্টা? এত উদ্দম? ভেস্তে গেল সব?

২৩শে মে এক দুষ্টু প্যাঁচ কষলাম। বললাম রতনকে: দেখ ভাই আমি কি ভাবছি জানো? ভাবছি শনিবার তোমার মাকে গিয়ে বলবো—উত্তরাকে অনুগ্রহ করে আপনার ঘরের বউ করেই নিন না! রতনের যখন এত পছন্দ—আমি অত্যন্ত খুশি হবো। তুমি বরং এর মধ্যে মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিও!

রতন বলল: মায়ের তো খুবই পছন্দ। মায়ের মন বোঝার জন্য তাকি আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি! তা তিনি বল্লেন, আপনার বা আমার যার সঙ্গেই হোক—তিনি একই রকম খুশি হবেন। কিন্তু তাতো আর হয় না মাখনদা—আমি যে উত্তরাকে ঠিক বোনের মত দেখেছি।

—রেখে দাও তোমার বোনের মত দেখা। ভাল ছেলেরা প্রথমে মেয়েদের ঐ ভাবেই দেখে থাকে। ভুলে গেলেই হোল সেকথা। মানে আমি কি বলতে চাই জানো? বলছি যে, গুড বয়—তুমি উত্তরাকে খুবই পছন্দ করে ফেলেছো। সে খবর তুমি নিজেও জান না।

কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইল রতন। তারপর আস্তে আস্তে বলল:

কি যে বলেন। তা কি হয় কখনো? না-না-না—মনের দিক থেকে আমি তা করতেই পারি না। রাণুবৌদির কাছে যাচ্ছি—আজ আপনার বৌ দেখাবো বলে কথা দিয়েছি যে!

—বেশ তো, বলেছ তাতে হয়েছে কি! তার আগে তুমি উত্তরার সংগে কথা বলেই নাও না আজ। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই ছাখো না—সে আমায় চায়, না তোমায়ই বিয়ে করতে চায়! তারো তো স্বাধীন মতামত আছে!

—কিন্তু, একটু মাথা চুলকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রতন: কেমন করে জিজ্ঞাসা করবো একথা?

—এক কাজ কর। "ফল অব বার্লিন" দেখাতে নিয়ে যাও আজ। "ফল অফ বার্লিন"এর হিরো-হিরোইন নাটাশা আর অ্যালেশার মত মনে করে নিয়ো নিজেদের। তারপর এক সময় সুযোগমত বলে ফেলো ফট করে!

—তা না হয় করলাম,—কিন্তু উত্তরা যদি আমাকেই বিয়ে করতে চায়? সে কিন্তু আমি মরে গেলেও করতে পারবো না। আপনাকে বিয়ে করতে রাজী না হলে আমিও করবো না, আপনিও না। আমি যে ওকে অন্য চোখে—

পরদিন বেলা ঠিক দশটায় ফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠল টেবিলে। ফোনটা তুলে হ্যালো করতেই শুনলাম: কে? মাখনদা?

—হ্যাঁ, বল কি খবর? গিয়েছিলে সিনেমায়?

—"ফল অব বার্লিন" দেখতে গিয়ে—রতনের গলার স্বর কাঁপতে লাগল,—আই হ্যাড এ গ্রেট ফল্ ইয়েস্টারডে। কথাকটি বলেই সংগে সংগে টেলিফোনটা ছেড়ে দিল সে।

# মধ্যবিত্ত

খাঁ খাঁ রোদ্দুর মাথায় করে ফিরলো সমীরণ।

বাড়িতে ঢুকে জয়াবতীকে শুয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। মধ্য-ক'লকাতার এক সরু গলিতে আধো-আলো আধো-অন্ধকারময় এক গুমোট ঘরে পুরনো একটা তক্তপোশের এককোণে একটা ময়লা বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন জয়াবতী।

'মা! মা!' বলে' ডাকতে ডাকতে সমীরণ বসলো গিয়ে তক্তপোশের উপর, জয়াবতীর গায়ে হাত রেখে।

জয়াবতী নিরুত্তর।

'কি হয়েছে বল না মা?'

তবুও জয়াবতীর কাছ থেকে কোনো উত্তর মেলে না। তেমনি ভাবেই মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছেন তিনি। বুকের দ্রুত ওঠানামায় মনে হচ্ছে—একটু আগেই খুব একচোট প্রাণখুলে কেঁদেছেন। তার রেশ এখনো যায়নি। মনে হচ্ছে, এখনো ফুঁপিয়ে চলেছেন মনের দুঃখ বুকে চেপে। দুঃখের বেগ বাগ মানতে চাইছে না কিছুতেই।

'মা! মা!' সমীরণ মুখটা তুলতে চেষ্টা করে মায়ের।

মুখটা বালিশের সাথে আরো জোরে চেপে ধরেন জয়াবতী, সেই সংগে ফোঁপানিও যায় বেড়ে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সত্যিই এবার সজোরে কেঁদে ফেলেন তিনি। দু'চোখ ফেটে দর্‌দর্‌ করে জল বেরিয়ে

আসে তাঁর। আর তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'দুর্-দুর্, সব দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। তোদের জন্যেইতো আমার এই দশা। তোরা সব মর্ মর্—মরে শেষ হয়ে যা। আমার হাড় জুড়োক।'

জননী জয়াবতী। জননীকে জন্মভূমি এবং স্বর্গের চেয়েও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর সেই জননীর মুখ থেকে কটু অভিশাপ বেরিয়ে আসছে। কিন্তু গায়ে এসে বেঁধে না সমীরণের। সমীরণ জানে, এতো অভিশাপ নয়! দুঃখের জ্বালায় জননীরা আজ জর্জ্জরিত, অতিষ্ঠ জীবনের দুঃসহ তাড়নায় মর্মছেঁড়া লাঞ্ছনার সকরুণ সুর আকাশে বাতাসে প্রকম্পিত। এ সুরের দহনজ্বালায় আরো কত জননী জ্বলে মরছে অহরহ! জননীর এমনি অভিশাপভরা ভৎর্সনা তো প্রায়ই শুনতে হয় তাকে। কাজেই, এতে অপার বিস্ময়-বোধের কোনো কারণ জাগে না তার মনে। সমীরণ জানে, জননীর মুখের বাণী তাঁর প্রাণের কথা তো নয়!

ন'টি সন্তানের জননী। বিয়ে হয়েছিল পনের বছর বয়সে; পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স এখন জয়াবতীর। এই ত্রিশ বছরে ছিবড়ের মত চুপ্‌সে গেছেন এগারোটি সন্তানের জন্ম দিয়ে। দু'টি গেছে মরে। একটি অর্থাৎ বড় মেয়েটি বিয়ে হয়ে চলে গেছে শ্বশুরবাড়িতে। বাকী আটটি নিয়ে তাঁর বর্তমান সংসার। সব ক'টিই গুটি গুটি এসে ঘিরে দাঁড়াল দাদাকে।

জয়াবতীর তৃতীয় সন্তান তেইশ বছরের কুমারী মেয়ে গীতা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। বাবা বলেন, ওর নাকি দাঁড়াতে ঠিক তিন কাঠা জমি লাগে। ঐ ধুম্‌সী মেয়েটাকে দেখলেই তাঁর গা জ্বলে যায়। ওকে দেখলেই দু'বেলা আহারের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর।

কাঁকর মেশানো চালের ভাত আর ডালের জল। তার সংগে কোনো দিন হয়তো কচু ভাজা, নয়তো বড়জোর সপ্তাদরের আনাজের একটা ঘ্যাঁট—প্রাণান্তকর সংগ্রহের এই তো প্রাত্যহিক বরাদ্দ। অথচ এই খেয়েও দিন-দিন মানুষ যে কি করে মেদ সঞ্চয় করতে পারে, ভেবে অবাক হয়ে যান তিনি। সমীরণ গীতাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে রে গীতা ?'

গীতা নির্বাক। কিই বা জবাব দেবে সে দাদার কথার ? কার দোষ দেবে সে ! বাবার, না মায়ের না নিজের ! তা সে বুঝে উঠতে পারে না। অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে শুধু চুপটি করে।

গীতাকে বাদ দিলে আর সব কটিরই শরীরের হাড় এক একখানা করে গোনা যায়।

গীতার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়াবতীর চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তান—আঠারো বছরের কানু আর ষোল বছরের পানু। ওদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তের বছরের ষষ্ঠ সন্তান—ফুটফুটে মেয়ে মঞ্জু। আর সপ্তম সন্তান—অঞ্জু। অঞ্জুর পাশেই কোলের ছেলে—দশ বছরের রঞ্জু। হাড্ডি-সার চেহারা, খালি দেহের একমাত্র আবরণ একটি ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট। সমস্ত ভাইবোনের মধ্যে এই রঞ্জুটাই একটু অন্য ধরনের। অন্য সবাই চুপ করে সব সহ্য করলে কি হবে—ও চুপ করে থাকতে পারে না কিছুতেই। মুখফোঁড় রঞ্জু বড় ফটফট্ করেই কথা বলে। কেয়ারই করে না কাউকে। ও বলে : যে বাড়িতে দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাওয়া যায় না, পরনের ভাল পোশাক মেলে না—সে বাড়িতে আবার কার তোয়াক্কা করবে সে ! বাবা কিছু বলে তো বেরিয়ে পড়বে। নিজের একটা পেট চালিয়ে নিতে পারবে না ! খুব পারবে। ভদ্দরলোকের ঘরে জন্মে বাপ বেঁচে থাকতেই যদি এত কষ্ট পেলাম,

তবে আর বস্তির ছোটলোকের ছেলেদের সংগে তারই বা তফাৎটা রইল কোথায়! রঞ্জুর এই ধরনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় জ্বলে গিয়ে এক একদিন আচ্ছা করে মার দেয় সমীরণ। বেদম প্রহারের চোটে আকুল কান্নায় গুমরে গুমরে থাকে কিছুদিন! আবার যে কে সেই! এই রঞ্জুরই মুখ খুললো সবার আগে।

'দাদা—বাবা না, আজ আবার মার সংগে ঝগড়া করেছে। জানো দাদা'—গলাটা একটু নামিয়ে বলে রঞ্জু, 'আজ রান্না হয়নি। বাবারই তো দোষ। রেশন আনার টাকা ছিল না,—মাকে বলে কি—গীতার গলার হারটা দাও। মা দেয়নি। তাই নিয়েই তো ঝগড়া।' বলতে বলতে মুখ কাঁচুমাচু হয়ে ওঠে রঞ্জুর, 'তাহলে কি আমরা না খেয়ে থাকবো দাদা!'

রঞ্জুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে সমীরণকে চুপ করে থাকতে দেখে সোজা হয়ে এবার উঠে বসেন জয়াবতী। মনের ঝাল মিটিয়ে নিতে চান রঞ্জুর উপর দিয়েই।

'না খেয়ে থাকবি না তো করবি কি! কে তোর সামনে সাত রকম সাজিয়ে এনে দেবে শুনি?—দাদা? তিনি তো বি, এ পাশ করে রাজা হয়ে বসে আছেন!'

জয়াবতীর শ্লেষাত্মক কথাগুলি বড় বিব্রত করে তোলে সমীরণকে 'তুমি ভেবো না মা, আমার একটা চাকরি হয়ে গেলে তোমার আর কোনো দুঃখ্ থাকবে না।' নরম হয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায় মাকে।

এইবার একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠেন জয়াবতী।

'তোর ধড়ে আর কবে বুদ্ধি হবে রে হতভাগা! রোজই তুই চাকরি জোগাড় করে আনার স্তোকবাক্য দিচ্ছিস, আর কতদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবি ওকথা বলে?'

তাঁর দুখের পাঁচালী সমীরণের চোখের সামনে তুলে ধরেন জয়াবতী একটি একটি করে।

'দ্যাখ্, দ্যাখ তো একবার রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে। একটা প্যাণ্টের অভাবে বাছা আমার বাইরে বেরোতে পারে না। কাঁদে। কানু আর পানুর আট মাসের ইস্কুলের মাইনে বাকী। নাম কেটে দিয়েছে বলে ইস্কুলে যেতে চায় না। বাকী মাইনে না দিলে পরীক্ষা দিতে দেবে না। এখন যদি একবার লেখাপড়ায় বাধা পায়, আর কি কিছু হবে কোনোদিন? ধাড়ি ধাড়ি মুখ্যু ছেলের দল কি করবে এর পরে?··· আর মঞ্জু? প্রাইমারী পাশ দিলে। লেখাপড়ায় কত ঝোঁক, ম্যাট্রিকটা পাশ করার মেয়ের আমার কত ইচ্ছে। পয়সা অভাবে বড় ইস্কুলে ভর্তি হতে পারলো না বলে কেঁদে কেঁদে মরে।'

'মা, আমি কি চাকরির কম চেষ্টা করছি। কিছুতেই যে জোগাড় করতে পারছি না।' সমীরণের কণ্ঠ থেকে করুণ কৈফিয়তের মতই বেরিয়ে আসে কথাগুলি।

'চাকরির বাজার বুঝলাম না হয় খারাপ।' ধীরে ধীরে এবার একটুখানি স্নেহের আবেগ সঞ্চারিত হয় জয়াবতীর মনে, 'দু'চারটে ছেলে পড়িয়ে চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা আনতে পারলেও তো ওদের পড়াশুনাটা বন্ধ হয় না। বুড়ো ধেড়ে যোয়ান মদ্দ ছেলের এটুকুও খেয়াল হয় না!'

সত্যিই তো! সমীরণের এদিকটায় তো খেয়াল হয়নি এতদিন। চাকরির কথাই ভেবেছে সে কেবল, ভেবে ভেবে মরীচিকার পিছনে ঘুরেছে। কিন্তু আর নয়, আজই টিউশানির সন্ধানে বেরোবে সে। টিউশানির টাকা দিয়ে ভাইবোনদের পড়ার ভার নিজের হাতে তুলে নেবে সে। কিন্তু—

রঞ্জুর একটু আগের কথা কয়টি মস্তিষ্কে উত্তাপ ধরিয়ে দেয়। 'আমরা না খেয়ে থাকবো দাদা ?' সেই কথা সমীরণের মনের দরজায় তীক্ষ্ণ ফলকের মত ধাক্কা দিতে থাকে বারবার। তার কথার কী জবাব দেবে সমীরণ ? হঠাৎ তার বাবার ওপর সমীরণের কেমন একটা আক্রোশ জাগে। কেন, কেন তিনি সংসার চালাতে পারেন না ঠিক মত! কি যে স্বভাব দাঁড়িয়েছে তাঁর—পয়সা না থাকলেই গয়নার জন্য এসে হাত পাতবেন মায়ের কাছে। এক একখানা করে মায়ের সব গয়নাই তো তুলে দিয়েছে বাবার হাতে। তবুও আশ মিটলো না! শেষ সম্বল গীতার গলার ওই লিকলিকে হার ছড়ার উপরও লোভ পড়ল তাঁর! আর না দিলেই রাগে লম্ফ ঝম্ফ। মায়ের ওপর অযথা তম্বি। এক এক সময় সমীরণের মনে হয়, অমন বাপ চুলোয় যাক। এইভাবে থাকার চেয়ে অমন বাপ না থাকাই ভাল। বেশ করেছে হার দেয়নি, বেশ করেছে মা। কিন্তু—

'...আমরা না খেয়ে থাকবো দাদা ?'

কচি কণ্ঠের ঐ সহজ সরল প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে ? জবাব তো কথায় দিলে চলবে না। এখুনি, এই মুহূর্তে আহারের বন্দোবস্ত করে দিতে পারলেই হবে রঞ্জুর কথার জবাব দেওয়া। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব ? একবার ভাইবোনেদের মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে আসে সমীরণ। আহা! বেচারাদের মুখ শুকনো।

মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে সমীরণের। বাইরে খাঁ খাঁ রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠেছে। অদূরের বড় বাড়িটায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। এতক্ষণে সমীরণের খেয়াল হয় অনেক বেলা হয়েছে। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছিল সে চাকরির ধান্দায়, আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়িয়েছে একটা চাকরি। কোথাও সুবিধা

হোল না। হাতে একটি পয়সাও নেই যে ট্রামে-বাসে চড়বে। নিত্যকার মত পায়ে হেঁটে ফিরতেই এত দেরী হয়ে গেল। কিন্তু— আবার ভাবতে থাকে সমীরণ, কি করে সে অন্তত আজকের দিনটার মতও অনাহার থেকে বাঁচাবে তার ভাইবোনদের! বাবার মতিগতি তো ভালরকমই জানে সে। যেদিন হাতে পয়সা থাকবে না, মার সংগে এমনি ভাবে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়বে—ভাইবোনেদের কাছে টাকা জোগাড়ের আশ্বাস দিয়ে। কিন্তু সমীরণ জানে, তাঁর আশ্বাস ভুয়ো। রাত্তির বাড়বার সংগে সংগেই ক্ষিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে ছেলেমেয়েগুলো যখন পড়বে ঘুমে এলিয়ে, তখন এসে তিনি বলবেন, বহু চেষ্টা করেও কারো কাছ থেকে সুবিধে করতে পারলাম না। তার পরদিন হয়তো তিনটে টাকা দিয়ে বলবেন দু'খানা কার্ডের রেশন নিয়ে এসো। এই তো হয়েছে সংসারের হাল। সংসারের কথা ভেবে ভেবে সমীরণের রাগ হয়ে যায় বাবার উপর। কেন, কেন এমন হবে? কিছু না হলেও পৌনে দু'শো টাকা তো মাইনে পান। পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাকী যা থাকে তাতে কি চলে না আমাদের দু'টি ডাল-ভাত খাওয়াও? জিজ্ঞেস করলে বলবেন, দেনায় দেনায় মাথা বিক্রী হয়ে আছে, মাইনে পাওয়ার সংগে সংগেই দেনা শোধ করতে হয়, আবার দেনা করে চালাতে হয় সারা মাস। যখন ধার আর মেলে না, তখনই অনাহার দেখা দেয়। হারামজাদা,— তুই কি আমার কষ্ট বুঝিস্ একটুও? বুঝলে কি আর অমন চাকরিটা হাতছাড়া করতিস!

অমন চাকরি মানে, বহু চেষ্টা চরিত্তির করে সমীরণের জন্যে একটা সুপারিশ জোগাড় করেছিলেন তার বাবা। ভাল চাকরি— পোশাক-না-পরা কনেষ্টবলের চাকরি।

জবাব সে বাবাকে দিয়েছিল। পুলিসের চাকরি করবে না। সেও ভাল কথা। কিন্তু এখন উপায়? ভাইবোনেরা কি তাই বলে উপোস করে থাকবে! না-না-না। তা কিছুতেই হতে পারে না, কিন্তু কি করবে তাই ভাবতে থাকে সমীরণ। সময়ে অসময়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধার নিয়েছে সে অনেক। কিন্তু শোধ দিতে পারে নি এক পয়সাও। অবশ্য বন্ধুরা তার জন্যে তাগাদা কেউ দেয় না। কিন্তু না দিলেই কি বারে বারে হাত পাতা যায় তাদের কাছে! বারবার ধার চাইতে তার নিজেকে কেমন যেন অসহায় ভিখারীর মত মনে হয়। আর পাঁচজনের মত তারো কি সম্ভ্রমবোধ থাকতে নেই একটুও! না-না, শোধ দিতে না পারলে আর ধার-কর্জ করা চলে না কারো কাছে। তবে কি করবে সে? কেমন করে রোধ করবে সে সাংসারিক এই অনাহারের জ্বালা? উপায়???

ভাবতে গিয়ে একজনের কথা মনে পড়ে যায় তার সর্ব্বাগ্রে। তিনি আর কেউ নন, সমীরণের দুরসম্পর্কের এক জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়তেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ে সমীরণ। এই জ্যাঠামশায়ই তাকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বি,এ পর্যন্ত পড়বার সমস্ত খরচা চালিয়েছিলেন—সমীরণের বাবার আর তাকে পড়াবার সামর্থ্য ছিল না শুনে। আর বাবার অভাব-অনটন তো চিরন্তন সাথী। যখনই জ্যাঠামশাইয়ের কানে গেছে তাদের কোনোরূপ অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদের কথা—তখনই ছুটে এসে বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন পাশে।

সেই জ্যাঠামশাই এখন অসুস্থ। আজ এমনি বিপদে তাঁর কাছে সে যায়ই বা কি করে! অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনের সংগে ধস্তাধস্তি করে শেষ পর্যন্ত সমীরণ ঠিক করে, যাবে সে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

জ্যাঠামশাইয়ের শরীর আগের চেয়ে সুস্থ। হ্যাঁ,—যাবেই সে, গিয়ে বলবে সব কথা। শুনলে বাবা হয়তো বকবেন। তা বকুন। কিন্তু জ্যাঠামশাইওতো পরে যদি শোনেন, সমীরণকে বলবেন, 'হারামজাদা, তোর জ্যাঠামশায় তো মরে যায়নি, তাকে একবার জানাতে পারলি না ?'

অন্তত গোটা দশেক টাকা আজ জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে আনতেই হবে। ভাইবোনেদের অনাহারী রাখা চলবে না। কঠিন বাস্তবের কাছে লজ্জা সংকোচ কিছুই নয়। সমীরণ ভাবে, টিউশানি করবে আর একটা চাকরিও সে জোগাড় করবেই। অর্থাগম হলে এ টাকা শোধ দিতে অবশ্য সে যাবে না। জ্যাঠামশাইয়ের ঋণ যে কখনো টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না, সে কথা সে ভালভাবেই জানে। কিন্তু উপার্জনক্ষম হলে জ্যাঠামশাইকে সুস্থ্য করে তোলবার ভার সে নিজেই নেবে। অনেক ভেবে সমীরণ ঠিক করলো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে যাবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাড়ির বাইরে পা ফেলতেই তার বাবার সংগে মুখোমুখী দেখা।

'কিরে সমু, কোথায় বেরুচ্ছিস ?'

সমীরণ ঠিক করেছে তার বাবার কথার কোনো জবাবই সে দেবে না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাবার প্রতি প্রচণ্ড অভিমান, তাদের না খাইয়ে রাখবেন কেন !

'কথা বলচিস্ না যে !'

'জ্যাঠামশাইকে দেখতে যাচ্ছি, অনেকদিন যাই না।'

'আমি সেখান থেকেই আসছি' বলে সমীরণের বাবা দ্রুত বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন।

পিছু ঘুরে সমীরণও বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করল বাবাকে, 'কেমন আছেন জ্যাঠামশাই ?'

বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরায় সবার মনেই আশার সঞ্চার হয়েছে। তাহলে এখন চাল-ডাল আসবে, আসবে বাজার—রান্না হবে। গরম গরম মা খেতে দেবে সবাইকে। কাউকেই আর উপোস করে থাকতে হবে না আজ। সমীরণের মা-ভাই-বোন সবাই মিলে আকুল দৃষ্টিতে চাইলো তার বাবার দিকে। কিন্তু কই! টাকা পয়সা তো কিছু বার করে দিচ্ছেন না মার কাছে! জামাটা খুলতে খুলতে সমীরণের বাবা সমীরণের কথার জবাব দিলেন এতক্ষণ পরে।

'ডাক্তার এক্স-রে করে বলেছে, দাদার টি,বি হয়েছে।'

'কি বললে!' চমক্ খাওয়া জয়াবতীর কণ্ঠ নিঃসৃত আর্তি ছিট্‌কে পড়লো নৈঃশব্দ্যের মাঝে।

ভাই বোনেরা সবাই ঠিক বুঝতে না পেরে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো।

আর সমীরণ স্তব্ধ—হতভম্ব। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর, কি মনে হোল তার কে জানে, ক্ষিপ্রপদে সহসা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে বাড়ি থেকে। হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত এক প্রচণ্ড আঘাতের ধাক্কায় তার মস্তিষ্কের চেতনাকেন্দ্র কঠিন বাস্তবের সামনে এলোমেলো হয়ে গেল।

অকস্মাৎ বেরিয়ে কোথায় চললো সে হন্ হন্ করে? কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। সবাই তাকিয়ে রইল শুধু স্থাণুর মত।

পথ চলতে চলতে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। তবুও চলছে সে। তপ্ত রোদের প্রখরতায় অবসন্ন দেহ ঝল্‌সে যাচ্ছে তার। আর অসংখ্য চিন্তায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে···। সেই সঙ্গে রঞ্জুর সেই প্রশ্নও সমীরণের মনের মধ্যে হাতুড়ীর মত ঘা মারছে অবিরত—

'আমরা কি না খেয়ে থাকবো দাদা ?' অঙ্গারের জ্বালায় প্রতপ্ত মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় আরো। ঘাম জমে ওঠে কপালে গালে সারা শরীরে। চিন্তান্বিত সমীরণ পথ চলতে চলতে এক সময় কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু করে জমে ওঠা স্বেদ কণিকাগুলি মুছে ফেলবার জন্যে তার হাত কপালে তোলে, আর তখুনি কি যেন নজরে পড়ে যায় তার। মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে হঠাৎ। আশু সমস্যার কি এক সমাধান মিলে গেছে তার।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফেরে সমীরণ। হাতে তার সাংসারিক সওদা—চাল-ডাল-তরিতরকারির বোঝা।

সাত তাড়াতাড়ি করে রান্না হয়। সবাই খেতে বসে। মা পরিবেশন করেন। সমীরণের পাতে আর এক হাতা ডাল তুলে দিতে গিয়ে আঁত্‌কে ওঠেন জয়াবতী : 'তোর আঙটিটা কি হোল রে সমু ?'

সমীরণ চুপ করে থাকে।

'পৈতের আঙটিটা গোল্লায় দিয়ে বুঝি পিণ্ডি গেলার ব্যবস্থা হোল !'

'না মা, বিক্রী করিনি। ওটা আমি বন্ধক রাখলাম আর উপায় না দেখে। তুমি ভেবো না মা আমি শীগ্‌গীরই ছাড়িয়ে আনবো।' জয়াবতীর বুক দুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শুধু।

চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে সমীরণ। নিজে বাঁচতে হবে, মানুষের মত করে বাঁচাতে হবে ভাইবোনেদের। জ্যাঠামশাইকেও বাঁচাতে হবে। সমীরণ ভাবে—কেমন করে কি করলে, আবশ্যক হলে বাঁচাতে পারা যাবে জ্যাঠামশাইয়ের অবর্তমানে তাঁর আশ্রিতবর্গকেও ?

চিন্তার কি আর শেষ আছে তার ?

শুধু চিন্তাই নয়, কাজেও এবার অগ্রসর হোল সমীরণ। চেষ্টা করতে লেগে গেল উঠে পড়ে।

চাকরি অবশ্য পেল না কিন্তু টিউশনি একটা মিলে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। মাসিক কুড়ি টাকার টিউশনি। হোক অল্প টাকা। তাই এখন সমীরণের কাছে যথেষ্ট। চেষ্টা করে গেলে আরো ছাত্র পাবে সে, ধীরে ধীরে রোজগার তার বেড়ে যাবেই। মনে জোর নিয়ে শক্ত হতে চেষ্টা করে।

আশা আর মনের জোর থাকলেই যে সবসময় চট্ করে কৃতকার্য হওয়া যায় না, কিছুদিন বাদেই একথা টের পেল সে। কিন্তু নিরুৎসাহ না হয়ে চেষ্টা করে যেতে থাকলো।

প্রথম মাসে টিউশনির কুড়ি টাকা থেকে মাকে কিছু দিল আর কিছু টাকার ভাল ভাল ফল ইত্যাদি নিয়ে গেল জ্যাঠামশাইকে দেখতে। অবস্থার কিছুই উন্নতি হয়নি তাঁর, বরং দিনের পর দিন অবনতিটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শুধু হাতে হলেও প্রায়ই জ্যাঠামশাইকে দেখে আসতে লাগলো সমীরণ।

জ্যাঠামশাইয়ের কাছে সঞ্চিত যা কিছু ছিল, খবর নিয়ে জানল, তা নিঃশেষ হতে বেশি দেরী লাগবে না। অথচ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দামী দামী ওষুধ, নিয়মিত পুষ্টিকর পথ্য—এসব কি করে জোগাড় হবে। ভাবতে ভাবতে সমীরণ এর যেন কোনো কূল কিনারা পায় না।

এদিকে বাবার শরীরও বিশেষ ভাল নয়, কিছুদিন ধরে কেমন যেন মনে হচ্ছে বাবাকে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরেন ক্লান্ত হয়ে। জিজ্ঞেস

করলে কাউকে কিছুই বলেন না। কেমন যেন আত্মসমাহিত হয়ে আছেন নিজের ভাবনার মধ্যে।

যতই অভিমান আর রাগ করুক সে বাবার উপর—বাবাকে দেখলে কিন্তু বড় মায়া হয় তার। জরাস্পর্শে প্রৌঢ়ত্বের মাঝেই একেবারে ক্ষীণ হয়ে আসছে তাঁর দেহখানা। দিন দিন বড় দুর্বল হয়ে পড়ছেন। আর কেনই বা হবে না—খরচা বেড়েছে চতুর্গুন, আয়টাতো আর বাড়েনি সেই অনুপাতে। মনে নেই শান্তি—শরীরও সেই সংগে ভেঙে পড়ছে অনিবার্যভাবে। অভাবের তাড়নায় মরমে মরে আছেন দিনরাত। এখন সংসারের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আর আর্থিক টানা-পোড়েনের মাঝে ঝুলতে ঝুলতে যে কদিন কাটে। সবই বোঝে সমীরণ, অন্তত বুঝতে চেষ্টা করে সে এখন। তাইতো সবদিকেই তার এত আকুলতা। অর্থ-অর্থ-অর্থ চাই। অর্থ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না এ দুনিয়ায়। তাই অর্থকরী দিকটার দুর্ভেদ্য পাঁকে পা দিয়েছে সমীরণ।

চিন্তার সংগে সংগে উদ্যমের অন্ত নেই বলেই মনোরথ কিছুটা পুর্ণ হয় তার।

দ্বিতীয় মাসে সমীরণের আরো দুটো টিউশনি সংগ্রহ হোল। দুটোয় একত্রে ত্রিশ টাকা। এ মাস থেকে মোট পঞ্চাশ টাকা পাবে সে! সমীরণ ভাবে, মা বলেছিলেন, চল্লিশ-পঞ্চাশটা টাকা হলে ছেলে-মেয়েগুলোর পড়াশুনাটা বন্ধ হয় না। কিন্তু—

ভাই বোনেদের লেখাপড়া চালানোর উপযোগী টাকাটার একটা উপায় হতে সে আরো সমস্যায় পড়ে গেল। কি করবে সে এ টাকা দিয়ে? ভাইবোনেদের লেখাপড়াই চালাবে, না সব টাকাটাই ব্যয় করবে জ্যাঠামশাইয়ের অসুখের জন্যে! অত বড় একটা অসুখে

মাসিক পঞ্চাশ টাকা সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্যেরই মত। ওতে তাঁরও কিছু হবে না, এদিকে ভাইবোনগুলোর লেখাপড়াও যাবে বন্ধ হয়ে। কি করবে সে! ভেবে ভেবে ঠিক করলো, না জ্যাঠামশাইকেই দিতে হবে এ টাকাটা। টাকার অংকটা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, প্রয়োজনের গুরুত্ব বেশি তাঁরই। আরো কিছুদিন না হয় পেছিয়েই যাক ওদের পড়াশুনা। জ্যাঠামশাইয়ের জীবনটাতো আগে!

মাকে বলে' বেরিয়েছে আজ জ্যাঠামশাইকে দেখতে যাবে। টাকা নিয়ে সন্ধ্যের দিকে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে হাজির হয়েছে সে, কেবল এসে পা দিয়েছে বাড়ির মধ্যে। এমন সময় দমকা হাওয়ার মত ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল সমীরণের দু'ভাই কানু আর পানু।

'বাবা গাড়ী চাপা পড়েছে দাদা, দেখবে চলো।'

'বলিস্ কি!' চোখদুটো কপালে উঠে যায় সমীরণের, ধড়াস্ করে ওঠে বুকের মধ্যে, 'বেঁচে আছেন তো?'

'হ্যাঁ। মাথায় লেগেছে, এখন একটু ভাল। জ্ঞান হবার পর হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে। আমরা দেখে এলাম।'

'কি করে এ্যাক্সিডেন্ট হোল?'

সে কথা বলতেও যেন ওদের মাথা কাটা যায়। চুপ করে থাকে দু'জনেই।

'বল্ না—কি হয়েছিল?' ধমকে ওঠে সমীরণ।

'বাবা নাকি অফিস ফেরৎ আমেরিকান ফাউণ্টেন পেন ফেরি করছিলেন ফুটপাতের ওপর—এমন সময় হল্লা গাড়ী আসায় ছুটে রাস্তা পার হয়ে পালাতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়'—

শুনে বাকশক্তি রোধ হয়ে যায় সমীরণের, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে জিজ্ঞেস্ করে, 'বাবা কথা বলতে পারছেন তো ?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন আপনি ফাউণ্টেন পেন ফেরি করতে গেলেন—ও তো ছোটলোকদের কাজ। তা উনি কোনো কথাই বললেন না, কেমনভাবে যেন চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে।'

আর শুনতে পারে না সমীরণ। শুনে দরকারো নেই। কিছুদিন ধরে কেন যে বাবার অফিস থেকে ফিরতে রাত হচ্ছিল সব আজ তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেমন করে যে তিনি সেদিন মাসের শেষে রঞ্জুর ইস্কুলের একমাসের টাকা দিলেন, গীতার জন্যে শাড়ী কিনে আনলেন—সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

অসীম দুর্ভাবনা নিয়ে সমীরণ ধুলোপায়েই বিদায় নিল জ্যাঠা-মশাইয়ের বাড়ি থেকে। প্রায় একরকম ছুটেই চললো সে হাসপাতালের দিকে।

এদিকে, সমীরণ কিন্তু জেনে যেতে পারলো না, যে তার প্রিয় জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থা সেদিন অত্যন্ত সংকটজনক। ডাক্তার বলে গেছে রাত কাটে কিনা সন্দেহ। আর তার পর থেকেই চাপা কান্নার এক একটা দমকে থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠছিল সমস্ত বাড়িটা।

# সুপ্তরাগ

ভৈরববাজার। যেখানে চিত্রা নদীর একটি শাখা বিরূপাক্ষের বাঁকে এসে মিশেছে তারই বালুচরের বিস্তৃত শ্যামল বনানীর নিবিড় ছায়া-ঘেরা এই গ্রামটি। বালুচরের উপর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করেও বোঝা শক্ত যে বনানীর অন্তরালে গ্রামের পর গ্রাম বিদ্যমান! এমনি নিবিড় আলিঙ্গনরত বৃক্ষশ্রেণী এর তিন দিকে।

পূবদিক খোলা। নির্জন নিস্তব্ধ সবুজ মাঠ। সুদূরপ্রসারী দিগন্তের স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম-আস্তরণের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে কখনো কখনো আত্মবিস্মৃত ভাবের উদ্রেক হয়। উতলা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত ক্ষণিকের জন্য মৃদু বাতাস এসে মাঝে মাঝে সবুজ চারাগুলির উপর নিঃশব্দে দোল দিয়ে যায়।

গ্রামের বুকের উপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা কাঁচা সড়ক সরীসৃপের গতির মত একেবারে পশ্চিমে নদীর বালুচর পর্যন্ত এসে পৌছেচে। নদীর ঘোলাটে জলের উপর বাঙলার বুক ধোয়া মাটির নিঃশব্দ শিহরণ।

আষাঢ়ের সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল।

দীর্ঘ ছয় বৎসর নিঃসঙ্গ কারাবাসের পর মৃণাল আজ মুক্তি পেয়েছে। এরই মধ্যে মৃত্যুর ভয়াবহ করাল মূর্তি লেলিহান জিহ্বা মেলে স্পর্শ করে গেছে তাকে বারকয়েক। তবুও কারাজীবনের মাঝে তুহিন্-শীতল করে সমাধির পথে টেনে নিতে পারেনি। বাদুড়ে-খাওয়া সুপারির

মত অবস্থা হয়েছে মৃণালের মুখখানার। পেশীবহুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও চুপসে গেছে ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভোগা শীর্ণ রোগীর মত। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি চাই—কোটরাগত দীপ্ত শাণিত চোখের তারায় এমনি এক ভাব। নদীর জলের ভাষার সঙ্গে সে চোখের ভাষাও যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে।

বাঙলার এই অখ্যাত পল্লীর বিখ্যাত দেশপ্রেমিকটি স্নেহমমতায়-ঘেরা ওই শ্যামল বনানীর মাঝে খোড়ো চালের টানে এসে দাঁড়িয়েছে বিরূপাক্ষ নদীর এপারে। খেয়ার অপেক্ষায়।

আসন্ন-গোধূলীর স্পর্শাতুর ভাবাবেশে জীব-জগত মায়াময় হয়ে উঠেছে। দিগন্তে দেখা দিয়েছে মায়াঞ্জন-রেখা। ভুরভুর করে বইছে মিষ্টি বাতাস। মুক্ত বাতাসে ভর করে মৃণাল যেন আজ মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করছে। ওই বাতাসে সে আজ অনুভব করছে এক সঞ্জীবনী শক্তির প্রবাহ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে ওপারের দিকে। বিরূপাক্ষের ভাঙন ধরেছে বেশ জোরালো ভাবেই। অবিরাম বেজেই চলেছে—ঝুপ্ ঝুপ্ ঝড়াং। ছিট্‌কে উঠছে জলরাশি ফেণা বিস্তার করে। পাকিয়ে উঠছে বৃত্তাকার ছোট ছোট ঘূর্ণী। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে জলকল্লোলের সাথে সাথেই। লক্ষ বুদ্বুদের মতই একটু একটু করে ধ্বসে যাচ্ছে তাদের ঐ গ্রামটি। কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা ঘরবাড়ি সবই। বিরূপাক্ষের অবিশ্রান্ত জল-গর্জনের স্বর কেমন যেন বিসদৃশভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। সেই সুরে যেন সমস্ত বাঙলাদেশের ভাঙনের কথাই বেজে চলেছে। এমনিভাবে তিল তিল করে অদৃশ্য সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই শ্যামল ধরণীর শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি! উন্মুক্ত খোলা আকাশের নিচে বাঙলার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতের মত

একদিন হয়তো রকমারী কংকালের স্তূপরাশি অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অতীতের স্বাক্ষ্যস্বরূপ।...এমনি সব উদ্ভট চিন্তার রাশি রাশি টুকরো এসে মৃণালের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে যেন স্তব্ধ করে দিতে চায়। আকস্মিক চিন্তার ঢেউ এসে ক্ষণে ক্ষণে আশ্রয় নিতে চায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে। নূতন নূতন চিন্তা এসে জমতে চায় একের পর এক। আর কেনই বা জমবে না!

পথে আসতে আসতে অনেক কিছুই দেখেছে সে। নতুন নতুন রাস্তা হয়েছে সব জঙ্গল কেটে কেটে। পীচ ঢালা মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি, বড় বড় ব্যারাক—মানুষের জন্য সারি সারি শয্যা-বিতান। কোথাও কোথাও ধু-ধু করা ক্ষেতের ওপর পড়েছে মাটি, ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি—অজস্র অ-যান্ত্রিক নিয়মে। দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেছে জমি, জল দাঁড়াবার আর আশংকা নেই এতটুকু! পড়েছে সেখানে তাঁবু। শত শত রাজহাঁসের প্রসারিত ডানা যেন সমষ্টিবদ্ধ।...শালখুঁটির মাথায় খড়ের বা টালির ছাউনি দেওয়া এক একখানা ঘর। এক-ইটের গাঁথনি তার দেওয়াল—পদস্থ সামরিক কর্মচারীর অস্থায়ী বাসভবন।...প্রকাণ্ড দৈত্যাকারের এক একখানা মোটর নিতান্ত উদ্ধতভাবেই ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে সেইসব রাস্তা দিয়ে। পোড়া পেট্রোলের বিকট গন্ধে চারিদিকের বাতাস ভার-মন্থর হয়ে ওঠে। সবাই তাকিয়ে থাকে ওই গাড়ীগুলো আর গায়ে উল্কী-আঁকা নতুন নতুন জীবগুলোর দিকে নিরীহ ভীত-দৃষ্টিতে। বেশ সমীহ করেই চলে যেন সব ওদের।

মনে পড়ছে সব মৃণালের, নিতান্ত একান্তভাবেই আজ মনে পড়ছে—এমন দিনে সবুজ ধানের শীষে বাতাসের সেই ঢেউ-জাগানো মধুর কাঁপন, মানুষের রক্তজল-করা শ্রমের উপহার, চাষীর সম্বৎসরের স্বপ্ন। কোথায়

সে সব মাঠ! যেখানে মাটির মানুষ ফলাতো সোনার ফসল? অধিকাংশের ওপরই তো সব কুর্তী-পরা এক একদল পীলে-চমকানো জীব। এ যেন ভেল্কী······

আর ভাবতে পারে না মৃণাল। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। দুর্বল দৃষ্টি আরো ঝাপসা হয়ে আসে। বালুচরের ওপর বসে পড়ে সে।

ওপারে খেয়া বাঁধা রয়েছে। কিন্তু পাটনীর খোঁজ নেই। সবই বিচিত্র বোধ হচ্ছে।

নদীর কূলে সারি সারি টাবুরে নৌকোর দল। দূর দেহাতের যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে যায় এরা। প্রতিদিনই—বারমাস। নদীর বুকে এদিকে ওদিকে নোঙর করা রয়েছে দু'একখানা মালটানা নৌকো। পিঁয়াজ রশুনের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে সেদিক থেকে। এগুলো নাকি মিলিটারী নৌকো। মালটানার কাজ নেই বলে এরা আরাম করে বসে আছে আর রসালো খানা পাকাচ্ছে। কতদিন ধরে কে জানে! মাইনে করা মাঝি সব। নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে এরা। করকরে নতুন নোট—টাকা আধুলি সিকি। সব নতুন নতুন। নতুন যাদুর স্পর্শে কি এক মায়ায় ঘিরে রয়েছে এরা। ভবিষ্যতের ভাবনা কখনো ভাবে না। চিন্তার মাপকাঠি অতদূর পৌঁছয় না বলেই বোধ হয়।

—কোথায় যাবেন বাবু? এক মাঝির ডাকে চমক ভাঙে মৃণালের।

—ওঃ হ্যাঁ, বাজারের ঘাটে পৌঁছে দিবি রে!

—এ্যাট্টা টাহা লাগবে বাবু।

—বলিস্ কি? বিস্ফারিত বিস্মিত চোখে মৃণাল মাঝির দিকে তাকালো। ভাল করে একবার স্মরণ করে দেখল, চার আনার বেশি কখনো দেয়নি সে এই জলপথটুকুর ভাড়া। আর এ চায় এক টাকা!

পিছনের দিকে তাকাতে গিয়ে স্মৃতির ওপর সাদা পর্দা নেমে আসে একটা। খবরের কাগজের বড় বড় হরফগুলো একবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চাল, ডাল, তেল, নুন সব জিনিসের দরই যেখানে বেড়ে গেছে হু হু করে সেখানে আর—

—আপনি যাবা বাবু? আমি তোমার কাছে বেশি চাইনি। এই রেট্।

রেট্! আপনি-তুমি সম্বোধন মেশানো এই লোকটিকে আর অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বলে—আচ্ছা চল্।

নৌকোয় পা দিতেই দুর্বলতার দরুণ মৃণাল টলতে টলতে বসে পড়ল ছইয়ের নিচে কোনোমতে। একজন কংকালসার বৃদ্ধ কৃষাণ দাঁড়িয়ে ছিল নৌকোর কাছেই। একা একখানা নৌকো ভাড়া করে যাবার মত সাধ্য নেই তার। সেও বাজারের ঘাটের যাত্রী। তাকে দেখিয়ে মাঝি জিজ্ঞাসা করল: বাবু, এই লোকটা বাজারের ঘাটেই যাবে। যদি অনুমতি দ্যান, দু'এক আনা হয় আমার।

—নে, আমার আপত্তি নেই। অন্যমনস্ক ভাবে বলল মৃণাল।

দীন কৃষাণটি গলুই-এর অদূরে এসে বসল সন্ত্রস্তভাবে। আধ-শোয়া অবস্থায় বাইরে দৃষ্টি মেলে পড়ে রইল মৃণাল। নৌকো চলতে আরম্ভ করল।

ছোট ছোট ঢেউ এসে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়। মাঝে মাঝে বৈঠার আঘাতে জল ছিটকে পড়ছে গলুই-এর ওপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে। জল-তরঙ্গে মধুর কল্লোল এক সুমধুর ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে। মৃদুমন্দভাবে বইছে প্রাণ-জুড়ানো দখিনা বাতাস। নদীর এপারে অদূরের কোনো গৃহস্থ-বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ঢেঁকীর পাড়ের তালে তালে একটানা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ আওয়াজ। কুলবধূরা

অবগুণ্ঠনের আড়ালে লাজ-নম্র আনত মুখে কেউ কেউ কলসী কাঁখে সিক্তবস্ত্রে ত্রস্তভাবে গৃহের দিকে ফিরছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় নৌকোর সাড়া পেয়েই ক্ষিপ্রপদে তিরোহিত হয়েছে কয়েকটি নারী। ওই যে ক্ষীণদেহ অর্ধবসনা যুবতী মেয়েটি ওই ঝুরি-নামা বটের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, একটু পরেই হয়তো ফিরে আসবে আবার। নির্জন ঘাটে একান্ত আপনার মনেই বুঝি বৈকালিক স্নান সেরে যেতে চায়। মুহূর্তের মধ্যে লজ্জা নিবারণ করতে গিয়ে কি প্রাণান্তিক চেষ্টাই না করেছে। ফলে, কাঁধের উপরের স্বল্প ছেঁড়াটুকু একেবারে বুক অবধি নেমে এসে তাকে নগ্ন করে ফেলেছে। নিরুপায় ক্ষোভে দাঁড়িয়ে আছে নিজেকে গাছের আড়াল করে। একটা মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সংগে সংগে মৃণাল দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ওদিক থেকে। অস্থিচর্মসার গরুর পাল মাঝে মাঝে হাম্বারবে পাড়ায় সাড়া জাগিয়ে চলেছে গৃহের পানে। তার পিছনে ততোধিক রুগ্নদেহ এক রাখাল বালক আপন মনেই গান ধরেছে। নৌকোর উপর দিয়ে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল চকিত-কলরবে দ্রুতগতিতে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তের ঐ সীমাহীন রেখার দিকে। পিছনে আবার আসছে এক ঝাঁক গাঙ্‌শালিক —ট্রি-ট্রি-ট্রি-ট্রি। নদীর জল মথিত করে নৌকো চলেছে তরঙ্গের হিল্লোল তুলে।

—কোন বাড়ি যাবেন বাবু? নীরবতা ভঙ্গ করে সেই বৃদ্ধ দীন কৃষাণটি কথা কয়ে উঠলো।

—উকীলবাবুর বাড়ি। মৃণাল বলল।

—উকীলবাবু আপনার কিডা হয়? কৃষাণটির কণ্ঠে আকস্মিক ঔৎসুক্য। কিন্তু কতকটা আত্মগতভাবেই কেমন নিরুৎসাহের সঙ্গে উত্তর দেয় মৃণাল: আমার বাবা।

—ও আপনি মিনু বাবু! আমাগো দেব্‌তা ?

কৃষাণটির মন অকস্মাৎ পিছিয়ে যায় ছ'বছর পূর্বে : একি শুনছে সব তারা! মিটিং হবে—স্বদেশী মিটিং। গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার পত্র ছড়িয়ে পড়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই।

তরুণের দল এসে শুনিয়ে যাচ্ছে : গ্রামকে যারা ভালবাসে, গ্রামকে যারা শ্রদ্ধা করে, মানুষের মত মানুষ হয়ে যারা বেঁচে থাকতে চায়, তাদেরই উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতা হবে। দেশের এবং দশের উন্নতিকল্পে বক্তৃতা করবে উকীলবাবুর ছেলে মিনুবাবু, আমাদের মৃণালদা।

গ্রামের প্রায় সমস্ত স্তরেই একটু একটু করে সাড়া জেগে উঠল। এক অদ্ভুত রকমে চকিত হয়ে উঠল সমস্ত অনুন্নত সম্প্রদায়।

বাজারের পুবদিকে একখণ্ড বিস্তৃত মাঠ। সেখানেই বক্তৃতার স্থান নির্ধারিত হোল। বক্তৃতা মঞ্চে এসে দাঁড়াল মৃণাল। প্রসারিত পেশল বুকে অনমনীয় দৃঢ়তা, দীর্ঘ দেহ কি এক নিশ্চিত স্থির-সংকল্পে ঋজু কঠিন, চোখের দৃষ্টি তীব্রতায় সমুজ্জ্বল।

তরুণ বয়সের একটি যুবক মৃণালের পাশে এসে শুনিয়ে দিল এক অগ্নিবাণী। সমস্ত আকাশ বাতাস ছাপিয়ে মন্দ্রিত হয়ে উঠল তার প্রতিধ্বনি।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়,—তাছাড়া বিশেষ করে মুসলমান চাষী মজুরের ভিড়ই বেশি। অসংখ্য অগণিত মানুষের মেলা। চোখে তাদের নূতন আলোর সন্ধানী দৃষ্টি। জনতা সাগ্রহে অপেক্ষমান।

মৃণাল আরম্ভ করল। চোখে তার তীব্র দ্যুতি : বন্ধুগণ, সর্বাগ্রে আমাদের কি কাজ ? আমাদের কাজ সংঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারীতের প্রতিকার করা, জমিদারী জুলুম বন্ধ করা, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়ানো। যে শাসকশ্রেণীর রক্ত-লোলুপ স্বরূপ জানতে আমাদের

আর বাকী নেই এতটুকু, সেই রক্ত-চোষা নাগপাশের ভুজবন্ধন থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের—

ঠিক সেই সময় আগে থেকে বন্দোবস্ত করা পুলিস-বাহিনী নিয়ে দারোগা সাহেব সভার মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল যেন। উন্মত্ত প্রভঞ্জনের দুর্জয় আক্রোশের কাছে প্রকৃতির শান্ত জীব-জগত যেমন অসহায় ভাবে অসীম করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে, কতকটা ঠিক তেমনি ভাবেই মৃণাল তার সহকর্মীদের নিয়ে এই দারোগার নিকট আত্মসমর্পণ করলো।

সমস্ত ব্যাপারটাই চকিতের জন্য একবার ঝিলিক দিয়ে গেল বৃদ্ধ কৃষাণটির স্মৃতিপটে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো তার সমস্ত অন্তর। কৃষাণটি কিছুতেই ভেবে পেল না তাদের জন্য কেন মৃণাল জেল খাটতে গেল। কিসের অভাব ছিল তার? বিয়ে-শাদী করে সেও তো আর পাঁচজনের মত নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারতো তার জীবন। কেন সে তাদের জন্য এত ক্লেশ ভোগ করতে গেল?...কেন?...কেন?

যতই ভাবতে চেষ্টা করে শ্রদ্ধা যেন ততই প্রগাঢ় হয়ে ওঠে মৃণালের উপর।—ওঃ আপনি আমাগো দেব্‌তা! সংগে সংগে গড় হয়ে প্রণাম করলো সে। কাঁদ-কাঁদ হয়ে কৃষাণ বললো: চিন্‌তি পারিনি হুজুর। মাফ করবেন। যা চেহারা অইছে আপনার!

গভীর অপলক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে মৃণাল ভ্রূ কুঞ্চিত করল: তোর নাম আন্‌ছার না?

—আজ্ঞে আন্‌ছার। ভয়-ভক্তি-ভালবাসা মিশ্রিত তার গলার স্বর।

—খুব কাবু হয়ে গেছি, নারে? অনেকদিন তোদের কাছ-ছাড়া হয়ে আছি, তাই আমিও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। শরীর দুর্বল, মনও ভাল নয়।

গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নৌকো এসে ভিড়লো বাজারের ঘাটে। নদীর উঁচু-পাড়ের উপরে অবিচ্ছিন্নভাবে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট বড় খুপরি। মুদীখানা-মনিহারী, চালের আড়ত, দর্জির দোকান। ওপাশে ময়রার দোকান, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, হেয়ার কাটিং সেলুন, কামারশালা। অদূরেই উত্তর দিকের দোচালা টিনের ওই যে ঘরখানা—ওটা ভৈরববাজার পোস্ট-অফিস। এ গাঁয়ের একমাত্র বাজার। যেখানে দিনে দুপুরে যখন তখন হাঁক দিলে কম্‌সে কম অন্তত দেড়শো লোক হল্লা করে উঠতো এক সংগে, সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই যে বাজারে বড় বড় আট দশটা ডে-লাইট্‌ ঝল্‌সে উঠতো দিনের আলোর সংগে পাল্লা দিতে—কোথায় গেল সে সব ?

যে বাজার আগের দিনে উদয়াস্তই জম-জমাট থাকতো, সে বাজারে এখন সপ্তাহে তিন দিন হাট হয়। তিনটে লাউ, দুটো শশা, একডালা পিঁয়াজ আর এক কেঁড়ে দুধ—এই নিয়ে ধুঁকতে থাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকজন মাত্র গ্রাম্য পসারী। দোকানপাট যা কয়েকটা আছে, হাটের দিন ছাড়া দিনের বেলায়ও প্রায় সব ক'টাই থাকে বন্ধ। সকালের দিকে বৃদ্ধ শশীমাস্টারই যা নিয়মিতভাবে পোস্ট অফিসের ঝাঁপটা খোলেন, আর সন্ধ্যেয় মিট্‌ মিট্‌ করে ওঠে শিবকালী চাটুয্যের "আনন্দময় হোমিওপ্যাথিক স্টোর"-এর বিবর্ণ বার্নিশ-ওঠা টেবিলের উপর কালিমাখা টেব্‌ল-ল্যাম্পটা। মোটের উপর, সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই—ভৈরববাজারের চেহারা আজ এমনি জৌলুষহীন। বাজারের দক্ষিণ-দিকের রাস্তাটা খানিক দূর পর্যন্ত সোজা চলে গেছে পুবমুখো! তারপর বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের আঁকা-বাঁকা উঁচু সড়কের দিকে। এই রাস্তা ধরেই চলছিল তারা।

—তারপর! ভাল তো আন্‌ছার ?

—আর ভাল! প্রাণান্তিক চেষ্টায় বিষণ্ণ হাসি হাসলো আন্‌ছার? আমাদের আর থাকাথাকি! দিন তো গেল বাবু ভুবন ভট্‌চায্যির। এই আকালের বাজারে কি রোজগারডাই না করলো!

—কি রকম! বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো মৃণাল।

—হ্যাঁ বাবু, সে যে কত টাকা আয় করলো, তার কি আর সীমে সংখ্যা আছে!

—নাস্তিক ব্রাহ্মণ বলে তাকে তো কেউ পুজো পার্বনে ডাকতো না—সে আবার এত টাকা আয় করলো কি করে?

—তালি শোনেন বাবু! আমাগো হরি পরামাণিক—চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো আন্‌ছারের, আর্দ্র স্বরে বলল: ওষুধ বিনে, রোগে ভুগে ভুগে, না খাতি পাইয়ে শেষ পর্যন্ত যেদিন সে চোখ উল্টোল, তার মাইয়েডা যাইয়ে হাজির হোল ওই ভুবন ভট্‌চায্যির বাড়ি। বলতি পারেনা কিছু, খালি কাঁদতিই লাগলো। খানিক্ষুণ চাইয়ে থাইয়ে ভট্‌চায্যি ধমকাইয়ে উঠলো: অমন কইরে না কাঁইদে কি বলতি চাস বল। তবু মাইয়েডা কাঁদতিই লাগলো। কাঁদতি কাঁদতি সে যা বললো সে আর কি শোনবেন! মাইয়েডার বাবার সৎকার করবে এমন সামথ্যি নেই। বলল: ভটচায্যি মশাই, আপনি ছাড়া কিডা আর গতি করবে। সব শুনে ভটচায্যি মশার দয়া হোল। বললেন: তা না হয় করলাম, কিন্তু তোর অবস্থা কি হবে! শেষ সম্বল ঘটি-বাটি যা ছিল সে তো আমার কাছে দিয়ে পরামাণিক সেদিন টাকা নিয়ে গেল। এখন তোর উপায় কি?

—আপনিই ভরসা ভটচায্যি মশাই! আমাগো কত দায়-বেদায় রক্ষে করিছেন আপনি। এ্যাহোন আপনি ছাড়া কার কাছেই বা যাবো!

তারপর ভটচাযি্য মশাই মাইয়েডারে নিয়ে গ্যালেন একদিন। দিন কতক পর ফিরে আইসে ঘাড় নাড়াইয়ে কলেন শহরের কোন ধান কলে নাহি তার চাকরি কইরে দেছেন।

এমনি অবস্থার তো কত মাইয়েই নিয়ে গেল। একদিন ভট্টচাযি্য নিজিই আমার বাড়ি আইসে হাজির। বললেন, এত মাইয়ের গতি কইরে দিলাম, তোর মাইয়েডারেও দে আন্‌ছার। এমনি কইরে আর কষ্ট দিস্ নে।

ভাবলাম, সোমত্ত মাইয়ে আমার। না খাতি পাইয়ে মরুক, সেও ভাল, তবু শহরে যাতি দেবো না। বললাম, না ভট্টচাযি্য মশাই শহরে গেলি জাত থাহে না, ধম্ম থাহে না, কুচরিত্তির হইয়ে যায়। মাইয়ে আমার মরুক, সেও ভাল, তবু তারে আমি শহরে যাতি দেবো না।

ভটচাযি্য বললো : দ্যাখ, তোরা যে এমনি মুখ্যু তা জানতাম না। তোরই ভালোর জন্যি আর ওই মাইয়েডার মুখ চাইয়ে আমি কলের মালিকরি কথা দিয়ে আলাম। গতরে খাটপে, পয়সা আয় করবে। এর মদ্যি আবার দ্বিধে কি আছে রে : যদি না খাওয়ায়েই মারতি চাস্ তো মার। আমার কি আসে যায় তাতে? তবে টাকাডা ওই মাইয়েডার মুখ চাইয়ে আমি আগাম আনিছিলাম কিনা—এই বলে এক গাদা নোট দ্যাহালেন আমারে। তারপর আবার বললেন : দ্যাখ চিন্তা কইরে আন্‌ছার। আমার কি! তোর বিবেচনায় যদি সবশুদ্ধ মরাই ভাল বুঝিস্ তো মর্।

ভাবলাম, পেটে দুটো ভাত দুরি থাক, একখণ্ড ত্যাকড়া অভাবে মাইয়েডা আমার কত কষ্টই পাচ্ছে। কোন্ দিন হয়তো ছাখপো ওই পরাণ মণ্ডলের বউডার মতন গাছের ডালে ঝুইলে আছে শুক্‌নো এ্যাট্টা ল্যাঙটা শরীর। অনেক ভাইবে শেষ পর্যন্ত দিলাম মাইয়েডারে

তারই হাতে তুলে। তারপর দেখতি দেখতি কতদিন গেল কাইটে। সেদিন শুনলাম, হলুদগাঁয়ের মোড়লের বড় ছেলে নাহি শহরে থাইকতো। সেই শহরের এক বেহুস্যা পাড়ারথে মাইয়েডারে উদ্ধার কইরে নিজিই শাদি করে আনিছে। বাবু—ওই শালা শয়তান ভটচায্যি এমনি কইরে সব মাইয়েগুলোর সব্বনাশ ঘটাইয়ে টাহার আণ্ডিল রোজগার করিছে। এ্যাহোন তার টিহিটাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার যদি বাবু সেই শালারে—নিরুদ্দেশ ভটচায্যির উপর একটা অসহায় আক্রোশে আনছারের শীর্ণ দেহটা কাঁপতে লাগলো ঠকঠক করে।

রাস্তার দুধারে দুলছে সুপারি-বীথি মৃদুমন্দভাবে, আর সেই তালে তালে দুলছে মৃণালের মাথার রুক্ষ চুলগুলি। মৃণাল বললো : সে নিয়ে আর আক্ষেপ করিস না আনছার। কি লাভ।

—আপনি আইছেন, এইবার নিশ্চিন্দি বাবু। আমাগো দুঃখু জানাই এমন এ্যাট্টা লোক নেই গিরামে।

—আমি কি চিরদিন থাকবো রে!

—বাবু আপনার মত ভরসা তো কেউ দেয় না! আমরা জোর পাই কেমন কইরে! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, চোখ রাঙালিই ভয় পাই। কিসি কি হয় জানি না তো!

সাহাদের আম বাগান পার হলেই এক হিজল গাছের নিভৃত-ছায়ায় বদন মণ্ডলের বাড়ি। বদন ছিল এ গাঁয়ের চাষী মোড়ল। সাতচালা বিরাট ঘর। মাটির হলেও এ তল্লাটে অমন মজবুত ঘর আর কারো ছিল না। এই ঘরখানা অনেক ভদ্র গৃহস্থেরও ঈর্ষার বস্তু ছিল একদিন। প্রতিকারহীন অসহায়ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে সে ঘরখানা। অতবড় ধানের গোলাটাও লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে? ইঃ, একেবারে আর কিছুই নেই!

এই কি তার চেনা গ্রাম! ছ' বছর আগেকার ভৈরববাজার? স্তব্ধতায়-ভরা জনবিরল পথ। কোনখান থেকে একটা মানুষের শব্দও ভেসে আসছে না। শুধু রিক্ততায়-ভরা বিষণ্ণতার মাঝে শেয়াল কুকুরের ডাক ছাড়া গ্রামে আর মানুষ নেই নাকি! ওই তো শীলদের বড় বাড়ি। শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। ডালপালায় জড়ানো ওই বড় আমগাছটা পেরোলেই বিধু ভটচায্যির দীন কুটির। তারপর আরো একটু এগুলেই ওই দেবদারু গাছটার পিছনেই উকীলবাবুর বাড়ি। এই ক'বছরের মধ্যে যে মন্বন্তর মহামারী বয়ে গেছে বাঙলাদেশের উপর দিয়ে, সে সব খবর জেলে বসে সংবাদপত্রে পেয়েছে মৃণাল।

ওই আমগাছের ছায়ায় এখনো টিঁকে আছে বিধু ভটচায্যির সেই পর্ণ কুটির! এখনো বেঁচে আছে তারা? কে আছে আর কে নেই তা' অনুমান করাও কঠিন। দেবদারু গাছটা পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে একটা অনিশ্চিত সন্দেহ আর অজানা আতংকে মৃণালের হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করে উঠলো একবার। বৃদ্ধ কৃষাণটি এবার বললো: গড় হই দেবতা।

—আচ্ছা আয়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মৃণাল। কি করবে সে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। যাবে সে ওখানে? আশপাশের জঙ্গল থেকে ভেকের আর অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু। কি বলে কাকে ডাকবে মনে মনে ভাবছে এমন সময় দেখলো তাদের দক্ষিণ দিকের ঘরখানার দরজাটা খুলে যেতেই বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। বেশ লালিমাযুক্ত চেহারা। আঁটসাট গোলগাল গড়ন। গলায় আঁচলের খুঁট জড়ানো। হাতে সন্ধ্যা-প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোয় দেখা গেল চোখের কোণে তার

গভীর বিষাদের কালিমা রেখা। তুলসী তলায় প্রদীপ-মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। চমকে উঠে মেয়েটি শুধাল : কে?

কয়েক মুহূর্ত মৃণাল তাকিয়ে রইলো তার দিকে। আগের চেয়ে এখন অনেক বড় হয়েছে মেয়েটি। দেখলে চেনাই যায় না। পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট। প্রতিটি অঙ্গ উজ্জ্বল যৌবনের আভায় শোভামণ্ডিত। মৃণাল বললো : কামনা! তুমি?

মুহূর্তে কামনার হাত থেকে প্রদীপটা খসে পড়লো মাটিতে। —মৃণালদা! বিস্ময়-বিমুগ্ধ উজ্জ্বল ছু'চোখে দেখা দিল আনন্দাশ্রু। সংগে সংগে লুটিয়ে পড়লো সে মৃণালের পায়ের উপর। ধীরে ধীরে তার হাত ধরে তুলে মৃণাল ডাকলো—কামনা! কামনা তার পেলব বাহুলতা ছু'খানি দিয়ে মৃণালের হাত ধরলো : কি চেহারা হয়েছে তোমার মৃণালদা! কামনার টানা টানা চোখে ভ্রূর নিচে সমবেদনায় দেখা দিয়েছে এক গভীর আনন্দ-অনুভূতির চাঞ্চল্য।

সান্ধ্য আকাশ তরল তমিস্রায় আচ্ছন্ন। চারিপাশের বনজঙ্গল প্রাকৃতিক নিয়মে মূক স্তব্ধতায় নিমগ্ন। তরল অন্ধকার একটু একটু করে গভীরতর হতে চলেছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও মৃণাল যেন দেখতে পেল, কামনার ছু'গাল বেয়ে টপ্-টপ্ করে ঝরে-পড়া অশ্রুধারা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। অকস্মাৎ মনে হোল, বিস্ময় ও আনন্দোজ্জ্বল ওই চোখের তারা ছু'টিতে মেশানো রয়েছে যেন ছ'বছর আগেকার সেই পূর্বাভাষ। মৃণালের চোখের সামনে কেউ যেন প্রকাণ্ড একখানা আয়না ধরেছে সোজাসুজিভাবে। সে দেখতে পাচ্ছে মিটিংয়ের আগের দিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে কামনা আচম্কা এসে থমকে দাঁড়ালো সামনে : কোথায় গিয়েছিলে মৃণালদা!

—কিন্তু এত রাত্রে এই অন্ধকারে তুমি!

—চুপ চুপ। আমি এখানে এসে তোমার জন্যে অনেক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। জানি, যত রাতই হোক, তুমি এই পথেই ফিরবে।

—কি ছেলেমানুষ! একা এই অন্ধকারে আসতে হয়!

—কেন, তুমি বুঝি মনে কর সাহস কেবল তোমারই বেশি। তাছাড়া এখন তো আমি একা নই!

—আচ্ছা, খুব সাহস বোঝা গেছে, চলো পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে।

মৃণালদা! সহসা মৃণালের হাত চেপে ধরলো কামনা।

—ওকি! অমন করে দাঁড়ালে কেন?

—এসব কি শুন্‌ছি বলতো মৃণালদা।

—কিসের কি শুন্‌ছো তুমি?

—তুমি নাকি বক্তৃতা করবে কাল?

—তাতে হয়েছে কি!

—শুনছি পুলিসে নাকি ধরে নিয়ে যাবে?

—যেতে পারে!

—এ্যাঁঃ, বল কি মৃণালদা! কি একটা অজানা আশংকায় কামনার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো মুহূর্তে। পরক্ষণেই দু'হাত ধরে ঝাঁকানি দিল একটা—বল মৃণালদা, তুমি ওখানে যাবে না! যদি তোমায় পুলিসে ধরে নিয়ে যায়! বল, বল মৃণালদা, তুমি যাবে না! ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো কামনা।

আলগোছে তার সুকোমল বাহুদুটি ধরে মৃণাল বলে যেতে লাগলো তার ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনা। ভাবী বাঙলার প্রতিচ্ছবি: সুখ-সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ আশায় আনন্দে উদ্বেলিত মানুষ। গাছের পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় নবমঞ্জরী, আকাশে বাতাসে প্রাণ-জুড়ানো

মর্মরধ্বনি, দিকে দিগন্তে লাবণ্যের বিদ্যুৎচ্ছটা। ধূ-ধূ করা দিক-প্রান্তর সোনার ফসলে পরিপূর্ণ, জয়যাত্রার প্রান্তরেখায় প্রত্যন্তদেশ লালিত্যময়, সোনালী রঙের অপরূপ বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত……। অদূরাগত জীবনের সার্থকতার মর্মবাণী।

শুনতে শুনতে কামনার মন নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে নিমগ্ন হয়ে গেল। আনন্দ এবং কৌতুক এক সংগেই দেখা দিল বুঝি। সেই অন্ধকারের মধ্যেও মৃণাল দেখতে পেল এক অপরূপ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কামনার শান্ত মুখমণ্ডল। গাঢ় সুমিষ্ট স্বরে বললো: ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার স্বপ্ন যেন সার্থক হয়ে ওঠে মৃণালদা।

হ্যাঁ, আজো তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন ওই একই কথা বলতে চায়। যে দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে মৃণালের দিকে—সে দৃষ্টিতে আর কিছু নেই। চোখের ওই নীরব ভাষায় লেখা আছে শুধু একটি কথা—সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি: তোমার স্বপ্ন যেন সার্থক হয়ে ওঠে মৃণালদা।

—কামনা, কামনা—ভিতর থেকে কে ডাকলো কামনাকে!

—কাকাবাবু ডাকছেন মৃণালদা। তাঁর জ্বর। চলো এখান থেকে।

কামনার পিছু পিছু মৃণাল ঘরের ভিতর এল। মৃণালকে কাছে টেনে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলেন সত্যদাসবাবু। তারপর বললেন: তুমি চলে যাবার পর সেই বছরই কামনা মা-বাপ হারালো; দীনবন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি যে আমি ওর ভার নিলাম। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ওকে তুলে দিয়ে গেল আমার হাতে। কতবড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সে আমার! আমি ছাড়া ওকে কেই বা দেখবে। ঐ একরত্তি মেয়ে তখন থেকে আমার কি সেবাটাই না করে চলেছে। ক্লান্তি দেখিনি কখনো। কামনা ছিল বলেই আমাকে এসে দেখতে পেলে।

মৃণালের সাহচর্যে কামনার সেবায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ্য হয়ে উঠলেন সত্যদাসবাবু। অনেকদিন আগেই তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন শরীরে আর কুলোয় না বলে।

সত্যদাসবাবু একদিন ডেকে কাছে বসালেন মৃণালকে। বললেন, 'ভ্যাখো মিনু, আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের সামনে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে—এ আমি দেখতে পারবো না। আমি চাই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ কর তুমি। ঘর সংসারে মন দাও এবার।'

'বাবা, আপনিই না একদিন বলেছিলেন যে যাত্রা সবে শুরু, এ যাত্রার শেষ নেই!' ছেলের একথার পর আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

নিভৃতে বসে সত্যদাসবাবু ভাবলেন অনেক কথাই। সবই লক্ষ্য করছেন তিনি। জেল থেকে ফিরে এসে আবার দেশের কাজে ভিড়ে পড়েছে মৃণাল। মোড়লদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে এসেছে সে। গড়ে তুলেছে কৃষক সমিতি। কিন্তু তিনি তো এ আর চান নি। চেয়েছিলেন, রাজনীতি থেকে এবার বিরত হোক মৃণাল। এসব তিনিও করেছেন একসময়। স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে দেশের মুক্তির জন্য তিনিও মাথা ঘামিয়েছেন খুব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হোল? রাজনীতির জটিল আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে তাঁর চিন্তাধারা একজায়গায় এসে থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে যাবার সুষ্ঠু পথ পেলেন না আর। ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ালেন। সংসারের কর্মচক্রের মধ্যে ফিরে এসে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে। তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেও সংসারী হোক। কামনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। কামনাকে সুখী করে তাঁর ছেলে তাঁকে একটু শান্তি দিক। কিন্তু শান্তি চাইলেই কি শান্তি পাওয়া যায়!

দিন কয়েকের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। নতুন কিছু নয়, সেই পুরনো বিষয়ই একটা। কয়েক বছরের বকেয়া খাজনার দায়ে চাষী পাড়ার বৃদ্ধ দয়ালকে জমিদারের লোকজন এসে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারী বাড়িতে আটকে রেখেছে। কৃষক সমিতির চেলাদের কানে কানে পৌঁছে গেল এ খবর। দল বেঁধে সবাই গিয়ে হাজির হোল সেখানে।

একটা গাছের গুঁড়ির সংগে বাঁধা ছিল বৃদ্ধ দয়ালের শীর্ণ দেহখানি।

'তোমরা আমারে বাঁচাও।' ডুকরে কেঁদে উঠল দয়াল সবাইকে দেখে।

জমিদার নৃসিংহবাবু বসেছিলেন একটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে। অপ্রত্যাশিতভাবে একসংগে এতগুলি আগন্তুকের পদক্ষেপে চমকে উঠলেন তিনি। চোখ তুলে তাকালেন তাদের দিকে।

'কি চাও তোমরা ?'

প্রায় জন পঞ্চাশেক কৃষক এসেছে দলবদ্ধ হয়ে। এদের মধ্য থেকে এগিয়ে গেল সেই বৃদ্ধ আনছার।

'এই জুলুম বন্ধ করতি চাই আমরা।'

প্রজাদের কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা তিনি জানেন। তাই কোর্ট ফোর্টের ধার ধারেন না এখনো। কিন্তু দুঁদে জমিদার নৃসিংহ-বাবুর জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। একি! এত লোক জোট বাঁধলো কি করে ? একটুক্ষণ চিন্তা করেই তিনি আঁচ করে নিলেন যে ঘটনার গতি গেছে পালটে। একটা রহস্যের গন্ধ যেন পাচ্ছেন এর মধ্যে। নইলে, এই পায়ের তলার মানুষগুলো সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত এত সাহস পায় কোথা থেকে! কিন্তু বুঝলেও তার জমিদারী রক্ত এই বর্বর মানুষগুলোর সামনে মাথা নিচু করতে

দিল না। তিনি গর্জে উঠলেন, 'স্পষ্ট করে বলো তোমরা, কি বলতে চাও ?'

'দয়ালরে নিয়ে যাবার জন্যি আইছি আমরা।'

'দয়ালের যে শুধু খাজনাই বাকী আছে তা নয়, দয়ালের বেয়াদপিও অসহ্য। ওর শাস্তি এখনো বাকী।' না ছাড়ার পক্ষে যুক্তি দেখালেন নৃসিংহবাবু।

'কেন, কি দোষ করিছে দয়াল ?'

'দোষ !' কি দোষ করেছে সে জবাবদিহিও এদের কাছে করতে হবে ? ধৈর্য আর রাখতে পারছিলেন না নৃসিংহবাবু। রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠলো তার। যেন পারলে এখুনি চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন মানুষ গুলোকে। কিন্তু না, এখন নয়। অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, 'আমার পেয়াদাকে অপমান করেছে।'

জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো দয়ালকে, 'কি হইছে রে দয়াল ?'

বৃদ্ধ দয়াল মুখ খুললো, 'জমিদার বাবু যা বললেন সত্যি। বেয়াদপি আমি কিছু বলতাম না, যদি পেয়াদা আমারে লাঠির ঘা দিয়ে কথা না বোলতো।'

'তয় ?' জনতার চোখগুলি জ্বলে উঠলো এক সংগে, 'দোষ কার ? আপনার পেয়াদার না দয়ালের ?'

আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না ! এই ইতর লোকগুলোর কাছে এত সওয়াল জবাবের সম্মুখীন হতে হবে জমিদার নৃসিংহ চৌধুরীকে ?

'আমার জমিদারীতে বাস করে তোমরা বিচারক হতে পার না। যেতে পারো এবার।'

'দয়ালরে ছাইড়ে গ্যান। চোলে যাবো আমরা।'

'দয়ালকে ছাড়া হবে না।'

'দয়ালরে না নিয়ে আমরা যাবো না।'

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হোল। জনতা ও জমিদারের লাঠিয়ালে সংঘর্ষ। দয়ালকে ছাড়িয়ে নিয়ে তবে এল ওরা। ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে নিজেরা জখম হোল কিছু, জমিদারের কয়েকজন লাঠিয়ালকেও শয্যাশায়ী করে এল।

তার পরদিনই কৃষক সমিতির অফিস পুলিসে তচনচ করে দিলো। সার্চ করা হোল মৃণালের ঘরখানাও। কয়েকজন গ্রেপ্তারও হোল।

সবই শুনলেন সত্যদাসবাবু। সংযমবাক এই মানুষটির নির্জন মনের একান্তে এই ছোট্ট ঘটনাটি একটা বিরাট বিস্ময় নিয়ে দেখা দিলো। আত্মজিজ্ঞাসায় সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত অশিক্ষিত এই চিরচেনা ভীরু মানুষগুলির এত বুকের জোর হোল কি করে? শুধু মিনুর কথায়, মিনুর নির্দেশে কি এ সম্ভব হতে পারে? না, মিনু বলেছিল, আজকের মানুষ জেগে উঠছে। এ কি তাই? ঠিক যেন পরিষ্কার হচ্ছে না ব্যাপারটা। সংশয় আর বিস্ময়ের দোলায় দুলতে লাগলেন সত্যদাসবাবু।

ঐ সামান্য ব্যাপার কিন্তু সামান্য হয়েই রইল না আর। কৃষক সমিতির তরফ থেকে সভা ডাকা হয়েছে। আসছে পূর্ণিমায় হলুদবাড়ির মাঠে জমায়েত হবে। সমিতির সাতজন যে এখনো হাজতে। এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে না?

সমিতির প্রধান পাণ্ডা আনছার একাই আজ একশো, এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে উঠল সেই। মনের মধ্যে জমে-ওঠা বারুদে আগুনের উত্তাপ লেগেছে তার, চেতনার বহ্নিশিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে

আনছারের জরাশীর্ণ দেহখানি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। প্রতি গ্রামের প্রতিটি রন্ধ্রে সবার কাছেই সংগঠনের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে সে।

এদিকে মৃণাল অসুস্থ্য হয়ে পড়ল। খুক্ খুক্ করে বার কয়েক কাশি।

বাইরে গিয়ে থুথু ফেললো। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখে খালি রক্ত, জমাট-বাঁধা তাজা রক্ত। কিছুদিন আগে আর একবার উঠেছিল এই রকম। শুরু হোল আবার। মৃণালের এবার আর বুঝতে বাকী রইল না যে যক্ষ্মার জীবাণু তার প্রতি অনু-পরমাণুতে জেঁকে বসেছে। আর নিস্তার নেই।

সত্যিই মৃণাল নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এক্স-রে করা হোল শহর থেকে। ডাক্তার বললে—ফুস্ফুস্ দুটোকেই ছেয়ে ফেলেছে। ইট ইজ টু লেট্। সত্যদাসবাবু কামনাকে জানতে দিলেন না কিছুই। তবুও সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মৃণালের সেবা করতে লেগে গেল উঠে পড়ে!

কিন্তু রোগ বেড়েই চলল দিনের পর দিন।

আজ পূর্ণিমা।

সভার আয়োজন হয়েছে রীতিমত ভাবেই। খোলা আকাশের নিচে বিস্তৃত দিক্-দিগন্তে প্রতিফলিত হচ্ছে পূর্ণিমার শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্নার রঙ। অলৌকিক আভায় দিক্‌পরিমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। শুভ্র নির্মেঘ আকাশে চিক্‌চিক্ করছে তারা—অজস্র অসংখ্য। ধীরে ধীরে জমে উঠছে মানুষ। হলুদবাড়ির নির্জন-নিস্তব্ধ মাঠের চেহারা বদলে গেছে

আজ। কাতারে কাতারে ভিড় করে আসছে সব—হাঁটু-ভরা ধুলো-কাদা-মাখা জীর্ণ শীর্ণ এক একখানা কংকাল। চোখে তাদের বহ্নি-শিখা, হাতে শানানো কাস্তে, মুখে তাদের অগ্নি-মন্ত্র······আকাশ-জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সহস্র মানুষের নিষেধ-ভাঙা মুক্তির পণ। আরো, আরো · গণনাতীত।

এত মানুষ এগিয়ে আসছে! আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে আনৃছার। তার খোচা খোচা গোঁফ দাড়িগুলো পর্যন্ত কী এক অপার্থিব আনন্দে শিউরে শিউরে উঠছে। কোটরাগত চোখের নিচে এসে জমছে জল। উতরোল হয়ে উঠেছে জনতার প্রাণ-মাতানো জয়ধ্বনি। মৃণালের জন্য—তাদের নেতার জন্য অপেক্ষমান তারা।

জানালার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মৃত্যু-পথগামী মৃণালের বিশীর্ণ মুখখানার উপর।

—মৃণালদা! কামনা ডাকলো।

কোথায় যেন প্রতিধ্বনিত হোল সে ডাক। মৃণালের মনে হোল, কে যেন অন্তহীন সাগরপার থেকে প্রাণভরে তাকে ডাকছে। সে স্বরে দূরত্বের ব্যবধান নেই। সমুদ্র কল্লোল তুচ্ছ করে সে ডাক যেন তার কানের ভিতর দিয়ে এসে মর্মে মর্মে বিঁধতে লাগলো।

—কামনা! মৃণাল ডাকলো এবার।

—মৃণালদা!

—স্বপ্ন কি আমার সার্থক হবে না কামনা! কামনার অন্তরাত্মা যেন শিউরে উঠলো একবার কিসের আশংকায়। সান্ত্বনার সুরে বললো: কেন হবে না মৃণালদা, নিশ্চয়ই হবে। মানুষের অসুখ হয় না? আবার সেরে ওঠে না? আবার তুমি সেরে উঠবে, আবার কাজ করবে—

—সেরে উঠবো! অসুখ সেরে যাবে! অবিশ্বাস মাখানো শুষ্ক হাসি হাসলো মৃণাল।

মৃণালের ক্ষীণ কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। একটু একটু করে ক্রমেই তার কথা জড়িয়ে আসছে। তবু আবার অতিকষ্টে টেনে টেনে বললো: সব চেয়ে বড় দুঃখ কামনা, আমার জীবনের অনেক কাজ বাকী র‍য়ে গেল। চলার পথের আদর্শ সম্পূর্ণ করে শান্তিতে মরতে পারলাম না। এই পর্যন্ত বলে আস্তে আস্তে ঢলে পড়লো মৃণাল। শিথিল হয়ে গেছে তার সমস্ত দেহ। থর্ থর্ করে কাঁপছে শুধু তার ঠোঁট দুটি। যেন আরো কিছু বলতে চায়। শেষ নিঃশ্বাসের সংগে সংগে তাও গেল থেমে। আর একটি কথাও বলতে পারলো না। একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ নির্বিকার।

একটা বুকফাটা আর্তনাদের সংগে সংগে কামনা আছড়ে পড়লো মৃণালের বুকের উপর। মৃণালদা! বীণার ঝংকারে করুণ রাগিনীর মত শতধা হয়ে ফেটে পড়লো সে স্বর। আর সে কি কান্না! থামতে কি চায়! কাটা ধমনীর মত উপ্‌চে উপ্‌চে রক্তের তোড় বেরোচ্ছে যেন কামনার দুচোখ দিয়ে।

নিশ্চল হয়ে বসে আছেন সত্যদাস বাবু। দূর আকাশের সম্মুখ সীমান্তে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। জ্যোৎস্নায় ভরা পূর্ণিমার নীল আকাশের মতই স্বচ্ছ সে দৃষ্টি। একটা গভীর তপ্তশ্বাসের সংগে সংগে ফিরে তাকালেন একবার এদিকে। শুভ্র জ্যোৎস্নার রূপালী আভায় মৃণালের মুখের নিচে গড়িয়ে-পড়া জমাট-বাঁধা কালো রক্ত চিক্ চিক্ করছে। অসংযত বেশবাসে মৃণালকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে কামনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এতক্ষণ ধরে যে কাঁদছিল, সে কান্নাও এরই মধ্যে কখন গেছে থেমে।

ততক্ষণে দিশেহারা জনতা খেই হারিয়ে ফেলেছে। শরতের আকাশের মতই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আকাশ-ভরা তারা ম্লান হয়ে আছে। বিরূপাক্ষের জল-গর্জনের যে সুর বাঙলাদেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করে একটু আগেও অনুরণন জাগিয়ে তুলছিল, তাও যেন গেছে থেমে। চাঁদিনী রাতে নদীর জল চক্ চক্ করছে। শুধু তেমনি ভাবে একটানা গতিতেই বয়ে চলেছে বিরূপাক্ষের উদ্দাম স্রোত। মৃণালের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে করে আর স্থির থাকতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেছে মাথায় তুলে নিয়ে আসবে আজ মৃণালকে।

…এগিয়ে আসছে, এগিয়েই আসছে তারা মৃণালের বাড়ির দিকে। জনতার অকস্মাৎ কলরোলে দিক্-প্রান্তর সচকিত হয়ে উঠছে, সজাগ হয়ে উঠছে। এগিয়ে আসছে তারা…

সত্যদাসবাবু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, মৃত পুত্রের বুকে শোকাতুর মূর্ছিতা কামনার পাণ্ডুর মুখখানার উপর থেকে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো—লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু ক্লিষ্ট মুখ। অসন্তোষ আর অন্যায়ের উত্তাল সমুদ্র। পুত্রশোক তার কাছে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। পুত্রের অসমাপ্ত কর্ম আজ সমাপ্ত করতে হবে তাঁকেই। বিধির বিধান আজ উল্টো হলেও, সুনিয়ন্ত্রন করতে হবে এই গণ-বিক্ষোভকে। হাতছানি দিয়ে তারা ডাকছে যে! যে সংশয়ের দোলায় এতদিন দুলেছে তাঁর মন, সে সংশয় কেটে গেছে। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন, মৃণালের কথাই ঠিক, সে ভুল করেনি। আজ পরিষ্কার তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মানুষ জেগেছে, সত্যিই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সব।

দৃঢ় সংকল্প চিত্তে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অচঞ্চল সত্যদাস

বাবুর প্রতিজ্ঞা-কঠোর বলিষ্ঠ দীর্ঘ রোমশ দেহটা একবার কেঁপে উঠল শুধু। যৌবনে যে প্রেরণা জেগে উঠেছিল একদিন তাঁর অন্তরে—মর জগতের বিভীষিকায় আজ আবার সেই সুপ্তরাগের নতুন জোয়ার এক নবীন স্পন্দন জাগিয়ে দিল তাঁর প্রতি ধমনীতে।

# অপরিচিতার চিঠি

শ্রীযুত বসন্তকুমার মৈত্র মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কিন্তু অপরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে আপনার নাম যশ খ্যাতি লোকমুখে এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে যে আপনাকে মনে হয় অতি আপনার জন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সারা দেশের লোক আপনাকে কে না জানে!

দেশের দশের জন্যই আপনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজীবন দেশের উন্নতির জন্য আপনি প্রাণ দিয়ে লড়ছেন। সামাজিক উন্নতির চিন্তা করছেন দেশের সকলের জন্য, সর্ব স্তরের মানুষের জন্য। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার কথা আজ আর কারো অজানা নয়। তাছাড়া বড় রাজনৈতিক দলের নেতা আপনি। যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত মানুষেরা আজ আপনার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। আমিও যে তাদেরই একজন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি মনের দুঃখ জানাতে। ভেবেছি, আপনিই পারবেন আমার একটি সমস্যার কিনারা করে দিতে। আমার জীবনের একটি জটিল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে।

জানি আপনার সময় খুব কম। নানা সমস্যা আর নানান কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় সব সময়। কিন্তু যত কাজই থাক, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, অনুগ্রহ করে পড়বেন এই

হতভাগিনীর চিঠিটা। আপনি একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক বলেই আপনার কাছে আমার পোড়া বরাতের কয়েকটি কথা সবিস্তারে জানিয়ে আমার দুঃখময় সমস্যার একটা সমাধানের জন্য হাজির হয়েছি। আশা করি, একটু ধৈর্যের সংগে আমার কাহিনীটি শুনবেন।

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমরা দু'বোন। বড় আমি ছোট ধীরা। আমার বাবার নাম শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের বাসাবাটি বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে। বাবার অল্প আয়ের দরুণ সংসার আমাদের সচ্ছল নয়। আর সেজন্যই খুব বেশি লেখাপড়া শিখতে পারিনি।

কৈশোর পার করে দিয়ে তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছি, ক্লাস টেন অবধি পড়ে ইস্তফা দিতে হোল লেখাপড়ায়। বাবা আর চালাতে পারলেন না। পড়াশুনো ছেড়ে মন দিতে হোল সংসারের কাজকর্মে।

যৌবনে পা দিতে না দিতেই তরতর করে বেড়ে উঠছিলাম। মা শশংকিত হয়ে উঠলেন। হামেশাই কানে আসতে লাগলো বাবার কাছে প্যানপ্যান করছেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ করার জন্যে।

বাবার কথা গোবিন্দের ইচ্ছা হলেই হয়ে যাবে।

একদিন মা বেশ জোর দিয়েই বললেন বাবাকে, কিছু সন্ধান-টন্ধান করছো ?

কিসের ! যেন চমকে উঠলেন বাবা।

বলি, মেয়েটার একটা গতি করবে—না কি ?

তা এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে !

ব্যস্ত হবো না ! কত বড়টি হয়েছে তা নজর রাখো ? এখন থেকে উঠে পড়ে না লাগলে কদ্দিনে পার করতে পারবে ?

তুমি আমি ভেবে এর কি করতে পারি ! বাবা বললেন, জন্ম মৃত্যু

বিবাহ এর কোনটাই মানুষের হাত নয়। গোবিন্দের ইচ্ছা হলেই হয়ে যাবে।

মায়ের প্রশ্ন আর বাবার এই ধরনের ছোটখাট উত্তর মাঝে মাঝেই শুনতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম আমার সামনে কথা উঠলেই পালিয়ে যেতাম। লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতাম। লজ্জাও করতো বেশ মজাও লাগতো। যদি কিছুদিন আমার বিয়ের সম্বন্ধে মা-বাবার মধ্যে কোনো রকম উচ্চবাচ্য না হোত, আবার শুনবার জন্যে মনটা ছুঁকছুঁক করতো।

একদিন আফিস থেকে ফিরে বাবা বললেন, এক ভদ্রলোক আমাকে দেখতে আসবেন রবিবারে। শুনে চনমন করে উঠলো শরীরটা। মনের মধ্যে কি একরকম আনন্দের ঢেউ খেলে খেলে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে এলেন পাত্রের বাবা। মা আগে থেকেই সাজগোছ করিয়ে রেখেছিলেন। মুখ নিচু করে গিয়ে দাঁড়ালাম ভদ্রলোকের সামনে। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করার পর আমাকে চলে আসতে বলা হোল। তারপর বাবার সংগে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলার পর ভদ্রলোক উঠে পড়লেন একসময়।

মেয়ে তার পছন্দ হয়েছে। তবে সবই গোবিন্দের ইচ্ছা, বাবা বললেন মাকে, ভদ্রলোকের খাঁই বড্ডো বেশি। নগদই দু'হাজার চান। তার উপর গয়নাগাটি ইত্যাদি। অতো দেবার সাধ্যি আমার কোথায়!

শুধু এই ভদ্রলোকই নয়, মাঝে মাঝে আরো অনেকে এলেন আমায় দেখতে। কাঠগড়ার কয়েদীর মত দাঁড়ালাম সকলের সামনে, জেরায় জেরায় নাজেহাল হয়ে গেলাম।

মেয়ে পছন্দ হয়তো দেনা-পাওনায় পোষায় না, দেনা-পাওনায় পোষালে ছেলে পছন্দ হয় না বাবার।

এমনি করতে করতে কুড়ি পেরিয়ে গেল আমার। মনে মনে ততদিনে বিয়ের আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছি। ভরা যৌবন আমার উথলে উঠলেও মনের আকাশে ভাটা পড়ে আসছে।

গরিবের ঘরে জন্মেছি, অত সখ কিসের! মনকে প্রবোধ দিলাম এইভাবে। আমার বিয়েতে যদি নিদেনপক্ষে পাঁচশো টাকাও লাগে, তাও তো ধার করতে হবে বাবাকে। সংসারই যেখানে ঠিকমত চলে না, সেখানে মেয়ের বিয়ে দেবার মত কথা তোলাই বা কেন? সমাজ! সংসার!! ধর্ম!!! কিন্তু গোবিন্দের তো ইচ্ছা নয়, কি করে বিয়ে হবে আমার?

বিয়ে হোক আর না হোক, সময় তো আর বসে থাকবে না। এক দুই করে আরও বছর পাঁচেক কেটে গেল। এতদিনে আমার ছোট বোন ধীরাও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।

এমন সময় একদিন বাবা তাঁর এক বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমাদের বাড়িতে একটি ছেলেকে আশ্রয় দিলেন। শুনলাম, মাসখানেকের মধ্যেই সে নিজের একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে নেবে। মা পছন্দ করতেন না বলে প্রথম মাসের মধ্যে তার সামনে কখনো যাইনি। বাড়িতে আমি ও ধীরা দু'টি সোমত্ত মেয়ে, তার উপর অনটনের সংসার। মা-তো বাবার উপর রীতিমত ব্যাজার: নিজেরা যা খাই, পরের ছেলেকে তো আর তা দেওয়া যায় না। তার জন্যে একটু ভালমন্দ ব্যবস্থা তো করতে হয়। মা বাবাকে বলেন, তোমার কি এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই? তাছাড়া যোয়ান মদ্দ ছেলে—

বাবা বলেন, কোলকাতায় নিজের কেউ থাকলে কি পরের বাড়িতে আসতো? বেচারার নতুন চাকরি। মেস-হোটেলের একটা বন্দোবস্ত

করে দু'দিন বাদেই তো চলে যাবে। যাহোক করে চালিয়ে নাওনা ক'টা দিন।

মা-বাবার কথাবার্তা বোধ হয় সুধীরের কানে গিয়েছিল। পরের মাসে পয়লা তারিখে অত্যন্ত বিনয়ের সংগেই একশোটি টাকা এনে সে তুলে দিয়েছিল মায়ের হাতে। বলেছিল, আমার মেসের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে মাসীমা, কাল থেকে আমি সেখানেই থাকবো। আপনাদের কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক। এই সামান্য টাকা ক'টি—

মায়ের স্বর বদলে গেল, সে কি বলছো বাবা, তুমি হ'চ্ছ ঘরের ছেলের মত। তুমি তো কোন অসুবিধে করোনি। আমাদের অভাবের সংসারে তুমিই বরং কষ্ট পাচ্ছো। না বাবা, আমি থাকতে তুমি অন্য কোথাও যেতে পাবে না। মা হাত দুটো চেপে ধরলেন তার। সুধীর আর না করতে পারলো না।

সেদিন থেকে সে আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গেল।

সুধীর কায়স্থের ছেলে বলে খাওয়ার পর এঁটো বাসন তাকে দিয়েই তোলানো হয়েছে এতদিন। এবার মা বললেন, ভদ্দরলোকের ছেলেকে দিয়ে এসব কাজ করানো কি ঠিক হচ্ছে? ও কাজটা আমিই সেরে নেবো, কি বলিস!

শুধু বললাম, তা এ্যাদ্দিনে খেয়াল হোল তোমার?

মা আর কিছু বললেন না।

তারপর একদিন আমাকে বললেন, সুধীর তো আমাদের ঘরের ছেলে, ওর বিছানাটা ঠিক করে রাখতে পারিস না তুই? এও বলে দিতে হবে আমায়!

সকালে সুধীরের মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দেওয়া, জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে সেটা ঠিক করে রাখা, সুধীরের আফিসের ভাত বেড়ে

দেওয়া, আফিস থেকে ফিরলে একটু হাওয়া করা,—জলখাবার দেওয়া একে একে এসব কাজ আমাকে দিয়ে মা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুধীরও সহজ হয়ে উঠলো বাড়ির লোকের মত।

একদিন আফিস ফেরৎ সুধীরের হাতে দেখি একটি ইলিশ মাছ। গঙ্গার। আর গঙ্গার জলের মতই পবিত্র মনে হয় ওর কণ্ঠস্বর: বড়দি, মাছের তরকারিটা আজ তুমি রাঁধবে?

প্রথমে বড়দি, তারপর তুমি। একটু চমকেই গেলাম। আপন জনের মত সুধীরের দিলখোলা ডাক ভারী মিষ্টি লাগলো।

এই প্রথম সুধীর আমায় বড়দি বলে ডাকলো। ধীরা আমায় ছোটবেলা থেকেই বড়দি বলে ডাকে। সুধীরও বেছে নিয়েছে ঐ ডাকটা। বয়সেও সুধীর বোধ হয় দু'এক বছরের ছোটই হবে আমার চেয়ে।

মাছটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, আমায় কেন রাঁধতে বলছো সুধীর?

সেদিন তোমার রান্নাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল, তাই।

খুব যত্ন করে আমিই রেঁধেছিলাম সেদিন। পরিতৃপ্তির সংগে খেতে খেতে রান্নার তারিফও করেছিল সে।

সুধীরের অমায়িক ব্যবহার দিনদিন ভালই লাগতে লাগলো। আর এই ভাল লাগাই কাল হোল আমার শেষ পর্যন্ত। সেই কথাই বলবো আজ, অকপটে আমার মনের সব কথা ব্যক্ত করবো বলেই তো লিখতে বসেছি আপনার কাছে।

অফিস থেকে ফেরার পর রোজকার মত সুধীরের ঘরে সেদিনও ঢুকেছি খাবার হাতে। লাল রঙের একটা শাড়ী পরনে আমার।

টেবিলের ওপর প্লেটটা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর খাবার অপেক্ষায়। কিন্তু অন্যদিনের মত খাবারের ওপর চোখ না রেখে সুধীর তার চোখদুটো রাখলো আমার চোখের ওপর।

'তোমাকে আজ ভারী ভাল লাগছে বড়দি।'

সুধীরের এ কথায় কি বলবো ভেবে পেলাম না।

'নতুন শাড়ীখানায় বেশ দেখাচ্ছে তোমায়।' সুধীর আবার বলল, আমার দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে থেকেই।

'কি যে বল সুধীর!' লজ্জায় দেহ আমার যেন কুঁকড়ে আসতে চাইলো।

'সত্যি বলছি, চোখ ফেরাতে পারছি না তোমার ওপর থেকে।' কেমন যেন ধরা গলায় সে বললো শেষের কথাক'টি।

অমনভাবে সুধীরকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুকটা দুলে উঠলো। ঝমঝম করে উঠলো শরীরটা।

বললাম, কি বলছো সুধীর!

'ঠিকই বলছি আমি।' সুধীর বলল, 'তোমাকে আমার ভারী ভাল লাগে বড়দি।'

এর আগে এত কাছাকাছি কোন পুরুষের সংগে মিশিনি কখনো। আমারই বয়সের কোন পুরুষ আমার মুখের ওপর আমারই রূপের প্রশংসা করবে, এ কথা ভাবিই নি কোনোদিন। ওর সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। সত্যিই চমৎকার মানিয়েছে তো আমাকে। সুধীর তাহলে মিথ্যে বলেনি! আমারও যে একটা রূপ আছে সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম অনেকদিন। সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম নতুন করে। আর আমাকেও যে কোনো পুরুষের

ভাল লাগতে পারে, সেই ভাসা ভাসা ধারণাটাও যেন পরিষ্কার হয়ে গেল এবার। এর পর একটা দারুণ ওলট পালট হয়ে গেল মনের মধ্যে। মাথার ভিতর কেমন যেন একটা তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। কি মনে করে ওকথা বললো সুধীর? কেন বললো?...তাহলে কি সুধীর আমাকে—ভাবতেই সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু ভাবনা কমলো না। মনের মধ্যে গুঞ্জনের ঢেউ খেলতে লাগলো। তাই যদি হবে, তাহলে বড়দি বলে ডাকে কেন আমায় সে? একটা কিছু বলতে হবে—সেই খাতিরেই কি ডাকে আমায় বড়দি বলে? কি বোকা দেখ তো ছেলেটা! আমাকে যদি ভালই লাগে তার, তাহলে মনের কথা বললেই তো চুকে যায়! হয়তো ঘাবড়ে গেছে, বলতে পারছে না লজ্জায়। ভাবছে—আমি কি ভাববো, মা-বাবাকে বলে দেবো হয়তো।...সুধীর, আমি তো তোমাকে এ ভাবে দেখিনি এর আগে! ভাবিনি তোমার কথা এমনভাবে! সত্যিই কি তুমি আমায়—? আমার মনের মধ্যে যে আগুণ ধরিয়ে দিলে। একি সত্যি! একি সত্যি সুধীর! তাই যদি হয়, তুমি আমায় স্পষ্ট করে বলছো না কেন একথা? · দুর ছাই, আমিই তো দেখছি বোকা! 'তোমাকে আমার ভারী ভাল লাগে বড়দি।' এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট করে বলবে সুধীর! ভালবাসার কথা কি মুখ ফুটে এর চেয়ে আর বেশি করে বলা যায়! ওটুকু বোধ হয় বুঝে নিতে হয়। · সুধীর, সুধীর আমার...যতই ভাবি সুধীরের কথা, ততই ভাল লাগে। ভাবতে ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যেন গান হয়ে আমার সারা শরীরের মধ্যে বাজতে থাকে সুধীরের কথাগুলি। কি মিষ্টি, কত ভাল সুধীর।

আমার খুশিভরা মনে এত দিন যে সরল স্নেহের টান ছিল মেশানো,

সুধীরই সে স্নেহের মোড় দিল ঘুরিয়ে। চোখের রঙ হোল রঙীন, মনের ভাষা গেল বদলে।

সকাল ন'টায় সুধীর বেরুত আফিসে। ফিরতো সন্ধ্যের পর। এই সারাটা দিন যে তারপর থেকে আমার কেমন করে কাটতো ঠিক বোঝাতে পারবো না। অনুক্ষণ সে যে কি অস্থিরতা! মনে হোত, সুধীরকে সবসময় দেখতে পেলেই যেন ভাল হয়। যতক্ষণ না বাড়ি ফিরতো মনটা ছটফট করতো আমার। বিকেলের কাজকর্ম সেরে প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করতাম ওর জন্যে। বাড়িতে ফিরলেই মনটা আনন্দে নেচে উঠতো। হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে বসলে, কোনদিন দু'খানা পরটা, কোনদিন হয়ত একটু হালুয়া নিজে হাতে তৈরী করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতাম সুধীরের সামনে।

আমার জন্য তোমার বড্ড খাটতে হয়। না বড়দি? খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলতো সুধীর।

নাও, নাও, খুব হয়েছে। অত আর কৃতজ্ঞতা না জানালেও চলবে। খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী ছেলেটির মত।

খেয়ে নিত সুধীর। তারপর চাইতো, নিষ্পলক চেয়েই থাকতো আমার দিকে। আর বলতো, এত যত্ন আমায় কেউ কোন দিন করেনি।

সুধীরের তৃপ্তিতে আমার মনটাও আনন্দে ভরে উঠতো, বুকটা দুলে দুলে উঠতো খুশির ধাক্কায়।

কিন্তু খুশিতে ভরে উঠলে কি হবে, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধতে থাকতো। সুধীর আমার মাথা খারাপ না করে ছাড়বে না দেখছি।

এখনো সে আমায় 'বড়দি' বলেই ডাকছে। কিন্তু কেন, কেন এত লুকোচুরি খেলা। এ খেলার শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! একটু শান্তি পাওয়া যায় মনের মধ্যে। ওর চোখের ওই চাউনির ভাষা যে ঠিক ধরতে পারছি না।

এমনি যখন দোটানার মধ্যে দিনগুলো কাটছে আমার, এমন সময় একদিন আড়াল থেকে শুনতে পেলাম মা বাবাকে বলছেন, সুধীর যদি আমাদের ঘরের ছেলে হোত তাহলে—

বাবার সেই পুরনো জবাব শুনতে পেলাম, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।

কিন্তু মায়ের কথার মধ্যে যে ইংগিত ছিল লুকনো, আমার কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শোনামাত্র লজ্জায় আনন্দে চোখ কান আমার গরম হয়ে উঠলো, শিউরে উঠলো একবার শরীরটা।

দিনে দিনে সুধীরের প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে গেল। এত বেড়ে গেল যে একদিন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। রাত্রে তখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আমার দু'চোখের পাতা এক হচ্ছে না কিছুতেই। শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে এক সময় উঠে পড়লাম। বাইরের একটু হাওয়া লাগালে বোধ হয় মাথাটা ঠাণ্ডা হতে পারে—এই ভেবে বারান্দায় একটু পায়চারি করতে গিয়ে দেখি সুধীরের ঘরের কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। খাটের ওপর শুয়ে বই পড়ছে সে। খালি গা। জানালা দিয়ে আসা তিরতিরে হাওয়ায় ঝিরঝির করে চুলগুলো নড়ছে তার। দু'এক গাছা কপালের ওপর এসেও পড়ছে মাঝে মাঝে। প্রশস্ত বুক দুলছে শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে। বেশ মন দিয়েই কি একটা বই পড়ছে যেন। ওর সুকুমার মুখখানির দিকে অনেক্ষণ ধরে চেয়ে থাকতে

থাকতে আমার মনের মধ্যে কী হয়ে গেল যেন। এক দারুণ আবেগে কেঁপে উঠল সারা শরীর। এক সেকেণ্ডও চিন্তা করার আর অবকাশ নিজেকে না দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সংগে সংগে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

কে? একটা অস্ফুট আওয়াজে চমকে উঠেছে সুধীর।

আমি।

বড়দি?

কথার জবাব না দিয়ে একেবারে গিয়ে উঠে বসলাম খাটের উপর। সুধীরের হাত দুটো ধরার সংগে সংগেই বাধাহীন অশ্রু নেমে এল দু'চোখ ছাপিয়ে। ওর বুকের ওপর মাথা রেখে আমাকে কাঁদতে দেখে সুধীর বললো, কি হয়েছে বড়দি?

বারবার তোমার ওই বড়দি ডাক আমাকে অসহ্য করে তুলেছে, তেমনি ভাবে কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিলাম, বড়দি বলে ডেকে ডেকে তুমি আর আমার কষ্ট বাড়িও না সুধীর।

আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন তুমি—

কান্না থামিয়ে সুধীরের বুকের সাথে মিশে গিয়ে তাকে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আমি কি চাই, কেন আমার এই অস্থিরতা। বলেছিলাম, সুধীর তুমি আমাকে বাঁচাও। বেশ সহানুভূতির সংগেই অনেকক্ষণ ধরে সুধীর শুনেছিল আমার সব কথা। তারপর ধাতস্থ হতে অনেক সময় লেগেছিল তার। শেষে বলেছিল, তাই যদি হয়, মনে হয়, আমিও সুখী হবো। আমিও যে একেবারে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে দুজনকেই যে চলে যেতে হবে এখান থেকে!

বলেছিলাম, তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজী।

সুধীর আমায় নিবিড় করে টেনে নিয়েছিল বুকের মাঝে। তার শক্ত

পেশল বুকের উষ্ণ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লো আমার সারা শরীরে। অনেক আলাপ আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

শেষ রাত্রের দিকে সুধীরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার একটু আগে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, ভোরের হাওয়ায় একফালি সরু চাঁদ থরথর করে কাঁপছে আকাশের বুকে। জানালার কাছের বাদাম গাছটার পাতা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে হেমন্তের জমে-ওঠা শিশির কণা ঝরে পডছে টুপটাপ শব্দে।

তারপর কযেক দিনের মধ্যেই মায়ের চোখে আমার চাল-চলন নাকি ভাল লাগলো না। একদিন আমাকে ডেকে বেশ রুষ্ট স্বরেই বললেন, এত বড় ধাড়ি মেয়ে হয়ে একটা অন্‌জাতের ছেলের সংগে অত হাসি-ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না তোর?

চোখ না তুলেই বললাম, তুমিই তো বল মা, সুধীর ঘরের ছেলে। তার সংগে কথা কওয়াটাই যদি এত দোষের, তো আগে বলোনি কেন?

কথা বলতে তো তোমায় কেউ নিষেধ করেনি, নিষেধ করা হচ্ছে অত ঢলাঢলি করতে। লেখাপড়া শিখেছো, আর এই সামান্য কথাটা পষ্ট করে না বললে বুঝবে না!

সত্যি, সেদিন বুঝেও বুঝিনি মায়ের কথা। ধূ-ধূ করা মরুভূমিতে হঠাৎ একটুখানি বৃষ্টির জল পড়লে বুঝি এমনিই হয়। কামনা বাসনা আমার আরো জোরালো হয়ে ওঠে। মনের সংগে ধস্তাধস্তি করেও নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারি না। যখন তখন ঢুকে পড়ি সুধীরের ঘরের মধ্যে। কখনো সখনো বেখেয়ালে দু' একটা বেফাঁস কথাও বলে ফেলি ওর সংগে। আর মায়ের কাছে বকুনি খাই।

কিন্তু এমনি ভাবে আর কদ্দিন চলতে পারে!

অথচ ধর্মপ্রাণ বাবা আমার। উঁচু ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ের বিয়ে হবে এক কায়স্থের ছেলের সংগে, একথা তাঁকে বললে আর রক্ষে নেই।

তাহলে উপায়?

ভাবতে গিয়ে এ সমস্যার সমাধান মেলে না।

অবশেষে সবার অগোচরে একদিন রাতের অন্ধকারে পাড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

দু'কামরার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে বেশ আনন্দেই দিন কাটবে ভেবে ছিলাম। নতুনের মোহে কত আশা কত কল্পনা দিয়ে গড়তে চেয়ে ছিলাম এক নতুন পৃথিবী। নতুন এক জগত—পাখির মত হালকা হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই যেখানে অবাধ আনন্দ উপভোগ করা চলে, ভুলিয়ে দিতে পারে পিছনের সব কিছুকেই। কিন্তু কল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল।

নতুন ঘর বাঁধবার পর সুধীরকে প্রায়ই তাগিদ দিতাম সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে। আমাদের অবস্থায় পড়লে যেমন আর পাঁচজনে করে থাকে। সামাজিক অবৈধতাকে আইনের উদার মহিমায় বৈধ স্বীকার করে নেওয়া। এ সব কথা, সুধীরই আমাকে বলেছিল। হচ্ছে হবে করে প্রায় মাস আষ্টেক কেটে গেল, রেজিষ্ট্রি করা আর হোল না। ইতিমধ্যে আমার শারিরীক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। মা হতে চলেছি যে!

তারপর এল সেই রাত। দুঃস্বপ্নে ঘেরা সাংঘাতিক এক দিন। সুধীরের কথা শুনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে সুধীর?'

'না, মাথা আমার ঠিকই আছে,' সুধীর বললো, 'মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাপার। সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। ভেবে দেখলাম, ইস্যুটা নষ্ট করে দিলে তোমাকে আমি সামাজিক মতে বিয়ে করতে পারবো। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেঁদে কেটে আমার মা-বাবাকে বললে, তাঁরা মত না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু এই অবস্থায়—

'মা-বাবার কাছে ভাল ছেলে হবার জন্যে তুমি পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলতে চাও? উঃ কি সাংঘাতিক তুমি! মনে যদি এতই ছিল, আগে বলোনি কেন আমায়?'

'বিশ্বাস করো, আমার মনে খারাপ কিছু ছিল না।'

'তবে কেন তুমি তোমার মা-বাবাকে ত্যাগ করতে পারছো না? আমি মেয়েমানুষ হয়ে যা পারলাম, তুমি পুরুষ হয়ে তা করতে পারো না?'

'এদিকটা আমি অত ভেবে দেখিনি। আমি বাবার বড় ছেলে, আমার উপর তাদের অনেক আশা ভরসা। বাবার কাছে আমি বড়ো দুর্বল, তাঁর প্রাণে আমি কখনো ব্যথা দিই নি। তাঁকে আঘাত দেবার মত সাহস আমার হয় না। কিন্তু তবুও বলছি আমি সব ঠিক করে ফেলবো। অফিসের কাজের কথা বলে দু'দিন যে আমি বাইরে গিয়েছিলাম, কোথায় জানো? বর্ধমানে। বাড়িতে। মার কাছে সব বলেছি— তুমি যে সন্তানের মা হতে চলেছ, ঐ একটি কথা ছাড়া। মা বেশ কায়দা করে বুঝিয়েছেন বাবাকে, রাজীও করিয়েছেন তাঁকে। এখন শুধু তোমার মত পেলেই—

'আমার চেয়ে, আমার পেটের ছেলেটার চেয়েও তোমার মা-বাবাই বড়ো হোল তোমার কাছে?'

'না তা নয়। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না আমার কথা। তুমি

আমার বাবাকে চেন না। তিনি যেমন কোমল তেমনি কঠিন। আমি যে অফিসে চাকরি করছি, সেটা বাবারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর। বাবাকে পরিত্যাগ করা মানেই চাকরিটা খোয়ানো। এই দুর্দিনের বাজারে চাকরি না থাকলে কেমন করে চলবে আমাদের সে কথা ভাবতে পারো ?

'তাই বলে একটা প্রাণ নষ্ট করবে ?'

'আমার উপর ভালবাসাই যদি তোমার সবচেয়ে বড়ো হয়, আমার বিশ্বাস, তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়েই এতে রাজী হবে তুমি।'

'আমার ভালবাসা পরীক্ষা করার কি আর কোন পথ খুঁজে পেলে না ?

'তুমি আমায় ভুল বুঝছো। আর কোনো উপায় নেই বলেই একথা বলছি তোমায়।'

'তাহলে এই তোমার শেষ কথা ?'

'ত্থাখো, দু'টোর যে কোন একটা হারাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু মা-বাবা আর সেই সংগে টাকা রোজগারের পথটাও যদি হারাতে হয়, তাহলে শুধু তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো ?'

'এই তোমার শেষ কথা ?'

'অত অধীর না হয়ে ভাল করে ভেবে ত্থাখো।' বললো স্থধীর।

সারারাত ঘুমুতে পারলাম না সেদিন। কি মাথামুণ্ডু আর ভেবে দেখবো ! যে কথা আমাকে শোনালো স্থধীর, এ যে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আমাদের মিলনের মাঝে যে সামাজিক বাধা আমাদের পথের কাঁটা হয়ে প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে দিয়ে এলাম। এর পরও যে আবার সামাজিক প্রশ্ন উঠতে পারে— একথা ভাববো কি করে ? স্থধীর চায় আমার পেটের সন্তানকে নষ্ট করে দিয়ে আমাকে কুমারী সাজিয়ে তার মা-বাবার কাছে হাজির করতে। এ

রকমই যদি মনের ইচ্ছে ছিল তার, তবে সন্তান জন্ম দেবার আগে সে ব্যবস্থা করেনি কেন সে? তাহলে তো আমার আপত্তির কিছু থাকতো না। নিজের মা-বাপকে হারিয়েছি, সুধীরের মা-বাপকেই নিজের বলে মেনে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করতাম। কিম্বা সিভিল ম্যারেজ করবে বলেছিল, তাই বা করলো না কেন? তাহলেও ওর বাবা গ্রহণ করতেন না, খবর পেলে চাকরিটি দিতেন খতম করে। কিন্তু তাতে কি এসে যেতো? বাজার যত খারাপই হোক চাকরি কি একদিন না একদিন জুটতো না আর একটা? না হয় কিছুদিন আর একটু কষ্টই করা যেত। সব কথাই বুঝিয়ে বললাম সুধীরকে, কিন্তু কিছুই হোল না। বুঝলাম, আসলে তার মন অত্যন্ত দুর্বল। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলেছে। খারাপ কিছু করবে ভেবে করেনি। কিন্তু এখন দেখছে সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কত কঠিন কাজ। সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে যে বুকের জোরের দরকার তা তার নেই।

রাতের পর রাত আসে, দিনের পর দিন। সুধীরকে বল জোগাতে চাই, ভরসা দিই। বোঝাতে চেষ্টা করি।

'থাক থাক, খুব হয়েছে। আমার এই সামান্য কথায় রাজী হতে পারলে না—আবার ভালবাসা দেখাতে চাও!' সুধীর বলে।

'তুমিই বা ভালবাসার কি নমুনাটা দেখাচ্ছ? পারো না আমার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে? পেটের ছেলেটার সর্বনাশ করতে চাও!'

এক কথা দু'কথায় কথাই বাড়ে। দিনের পর দিন খিটির-মিটির ঝগড়াঝাটি হয়। এমনিভাবে কেটে গেল আরো কিছুদিন।

যথাসময়ে জন্ম দিলাম একটি সন্তানের। ছেলে নয়, মেয়ের মা হলাম। চাঁদের মত মেয়ে। মাতৃত্বের গর্বে বুক ভরে উঠলো।

কিন্তু তারপর?

তার পরের ঘটনা যেন এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু যা আমার জীবনে সত্যি হয়েই রইলো, তা বিশ্বাস না করে উপায় কি!

ট্রাভেলিং সেলস্‌ম্যান-এর চাকরি করতো সুধীর। মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হোত। এবারেও গেল। কিন্তু দু'দিনের নাম করে এক সপ্তা দু'সপ্তা করে দু'মাস কেটে গেল। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে নানান রকম দুশ্চিন্তা করতে করতে যখন প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি এমন সময় একদিন চিঠি পেলাম একখানা। খামখানা হাতে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, আমারই নামের চিঠি। তাহলে? তাহলে সুধীর আমায় একেবারে ছেড়ে যায়নি? তাই কি যেতে পারে কখনো! নিশ্চয়ই লিখেছে, আমি আসছি অমুক দিন, অমুক তারিখে। কাজের চাপে এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, জানাতে পারিনি। আমি না থাকায় তোমার বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছে এতদিন। ক্ষমা করো আমায়।···

ক্ষমা করবো বৈকি, নিশ্চয়ই ক্ষমা করবো সুধীরকে। ও তো আর আমার পর নয়।

কিন্তু চিঠিটা খুলে থ হয়ে গেলাম। পড়া শেষ করে বুঝলাম, চিঠিখানা আসছে সুধীরের কাছ থেকে না, তার বাবার কাছ থেকে। মা বলেই সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন,—'তোমাদের সব কথাই আমার কানে পৌঁছেচে। এবং পৌঁছবার পরই কলে-কৌশলে আমার ছেলেকে আমি পাকড়াও করে এনেছি। তুমি সৎ ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে। তোমার সংগে আমার ছেলের বিয়ে দিতে এতটুকু আপত্তি উঠতো না। কিন্তু যখন শুনলাম তোমাদের কীর্তি-কলাপের কথা, তখন লজ্জায় আমার মাথাটা মাটির সংগে মিশে গেল। বিয়ের আগে যে মেয়ে পরপুরুষের সংগে বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে, সে মেয়ে কখনোই ভাল হতে পারে না।

এই আমার মত। দেখলাম, মাথাটা তুমি ওর খেয়ে দিয়েছো একেবারেই। যে ছেলে আমার মুখের সামনে কথা বলতে পারে না—সে বলে কিনা, ঐ মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো ! কি ধৃষ্টতা ছেলের !

সব সহ্য করতে পারি কিন্তু অনাচার আমি সহ্য করতে পারি না কিছুতেই। তুমি জেনে রাখো, সুধীরকে বম্বে বদলী করে দেওয়া হয়েছে কোলকাতা থেকে। আর শীগগীরই আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থাও করছি। আমার ছেলে তো সুধীর। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ভুল করেছে সে, খুবই ভুল করেছে। সেজন্য সে অনুতপ্ত। আর আমিও ক্ষমা করেছি তাকে।

সেই সংগে তোমার কথাও যে আমি ভাবি নি তা নয়। তোমার দোষ থাকলেও তোমার বর্তমান অবস্থার জন্যে আমার ছেলেও দায়ী। তাই ঠিক করেছি, তোমার ভরণপোষণের জন্য যতদিন তোমার একটা ব্যবস্থা করে নিতে না পারবে, তোমাকে আমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবো।'

চিঠিটা শেষ করার সংগে সংগে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হোল—দেখি, ঝিটা হাওয়া করছে। ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম। ভাবনা চিন্তার আর কিছু ছিল না। মনে মনে শুধু বললাম, হে ভগবান, এই ছিল আমার কপালে !

সুধীরকে কোন কিছুর জন্যে দায়ী করতে আর মন চাইল না। দোষ আমারই, আমার পোড়া অদৃষ্টের। ভাগ্যের খেলায় সমাজ ছেড়ে নিজের ইচ্ছায় ঘরের বার হয়ে এসে যদি অপরাধ করেই থাকি, তাহলে সে দায়িত্ব তো আমারই। কিন্তু অন্যায় তো আমি কিছু করিনি। কাজেই ভেঙ্গে পড়তে মন চাইলো না।

কয়েকদিনের মধ্যে সত্যিই একটা মনি অর্ডার এল। সুধীরের বাবার দেওয়া টাকা ছুঁতে মন চাইলো না। ও রকম দয়ার দান গ্রহণ করে জীবনের জ্বালা আর বাড়িয়ে লাভ কি ?

নতুন বাসা করার পর পয়সা খরচ করেই ঘর সাজিয়েছিল সুধীর। একআধখানা করে কিছু গয়নাগাটিও করে দিয়েছিল আমায়। একে একে সেইসব বিক্রি করেই চলতে লাগলো। যখন বিক্রি করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না, তখন স্থির করলাম চাকরি করবো। নিজের জন্যে নয়, মেয়েটার জন্যে তো ভাবতে হবে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আমার।

ঠিকে ঝিই আমার সন্ধান করে দিল একটা কাজ। অসুস্থ্য এক ভদ্রলোকের শুশ্রূষা করতে হবে। ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন অনেকদিন ধরে। খাওয়া থাকা বাদে রোজ দু'টাকা। তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। বেশি লেখাপড়া শিখিনি। এর চেয়ে আর ভাল চাকরি এখুনি আমার আশা করাও হয়তো অন্যায়।

পয়সাওলা ভদ্রলোক—স্ত্রী গত হয়েছেন অল্প কিছুদিন। বয়স বেশি নয়। গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে। তাদের সবসময় দেখাশুনোর জন্যে একটা ঝি রেখে নিয়েছেন। সেই ঝিয়ের জিম্মায় পড়ল আমার মেয়েটিও। আমি আমার ডিউটিতে লেগে গেলাম। সময়মত ওষুধ খাওয়ানো টেম্পারেচার নেওয়া, পথ্য করানো, মাথায় বরফ দেওয়া—সব কিছুই করে যেতে লাগলাম ঘড়ির কাঁটা ধরে। অনবরতই থাকতে হয় রুগীর কাছে। সেবা করতে হয় দিনরাত।

ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠলেন তিনি। আমার সেবায় খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। অন্নপথ্য করার পর একদিন বললেন: আপনি আমার এখানেই থেকে যান।

আপনি তো সুস্থ হয়ে উঠেছেন বিনয়বাবু, আবার কেন আমাকে আটকে রাখতে চাইছেন, বললাম আমি।

আপনার সেবার মধ্যে এত আন্তরিকতা দেখেছি যে আপনাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না আমার। ভাবছি, ছেলেমেয়েগুলোর ভার যদি আপনার হাতে সঁপে দিতে পারতাম—

আপনার স্ত্রী নেই। বয়স অল্প। আর আমিও বুড়িয়ে যাইনি। এ অবস্থায় আপনার এখানে থাকলে নানান কথা উঠবে লোকসমাজে।

লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। সামান্য কদিন দেখলেও এটুকু বুঝেছি আপনি থাকলে ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হবে আমার। দয়া করে থাকুন না আপনি?

বিনয়বাবুর বিনয়ী কথার ভঙ্গীতে মনে হোল উনি যেন অন্তরের সংগে মিনতিই জানাচ্ছেন আমায়। সহায় সম্বলহারা নারীর অন্ধকার ভবিষ্যতের সামনে একটুখানি আলোর আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠলেও বোকামির ফাঁদে পা দিতে মন চাইলো না সহজে। আশ্রয় যদি পেতেই হয়, খুঁটিটা শক্ত কিনা ঝাঁকিয়ে দেখতে হবে।

একটি শর্তে আপনার কাছে থাকতে পারি বিনয়বাবু।

বলুন।

আমাকে বিয়ে করতে পারবেন?

জবাবটা যেন তৈরীই ছিল, মোলায়েম করে বললেন তিনি, আপনার মুখে সব কথাই তো শুনেছি সেদিন, আমিও ভাবছিলাম—ওদের মায়ের মতই থাকুন এখানে।

আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছেন তাহলে?

করতে পারলে খুশিই হতাম, অত্যন্ত নরম গলায় বললেন বিনয়বাবু: অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার মেয়েটি না থাকলে—

কথা ত নয়, শপাং করে যেন একখানা চাবুক পড়লো আমার পিঠে। ভেবে দেখতে গেলে অবশ্য নিতান্ত কম উদারতা দেখাননি বিনয়বাবু। মেয়েটি না থাকলে আমার বিগতজীবনের অবৈধ কার্যকলাপ জানা সত্ত্বেও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হতেন। এও কি কম কথা? আমার ফেলে আসা জীবনটাকে বোধ করি, সে ক্ষেত্রে, গোপন রাখার সুযোগ পেতেন সবার কাছে! শুনে অবধি রী রী করে জ্বলতে লাগল আমার সর্বশরীর।

মেয়েটি না থাকলে বিনয়বাবুর আমাকে বিয়ে করায় কোনো আপত্তি থাকতো না। অথচ এই বিনয়বাবুই যদি সাতটি সন্তানের পিতা হয়েও একটি কুমারী মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে চান তো তাতে নারীর অমর্যাদার কোনো প্রশ্নই উঠবে না। কারণ সেটা সমাজের রীতির বাইরে নয়। আর রীতির বাইরে বলেই আমাকে মেয়ে-সমেত বিয়ে করা চলে না। মনের জোর নেই বলেই এটা বিনয়বাবুর মনের কথা। সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ তিনি করবেন কি করে?

কিন্তু তার ছেলেমেয়ে দেখাশোনার নাম করে রক্ষিতার মত আমাকে রাখতে গিয়ে যদি লোকের দু'কথা শুনতেও হয়, তার জন্যে ঝগড়া করতে তিনি প্রস্তুত! খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক বিচারে, পা পিছলে গেলেও পুরুষের দোষ মাপ করা যায়। আর নারীর বেলায়, ভুল করলে ভুলের মাশুল তাকে দিতে হয় জীবনভোর।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে এলাম। বুকটায় যেন আমার কেউ মস্ত একখানা পাথর চাপা দিয়েছে। সেই পাথর চাপা বেদনায় দুঃখময় জীবন আমার থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। নারিত্বের অবমাননায় দুমড়ে মুচড়ে উঠল সমস্ত অন্তরটা। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে একবার ভুল করেছি, তাই বলে কি বার বার একই অপমান

সইতে হবে আমায় ? চোখের জলে ভেজা আমার এই পাষাণ ভার যদি লাঘব করার আর কোনো উপায় না থাকে—তাহলে আত্মহত্যাই ভাল। কিন্তু না। চাঁদের মত মেয়ে আমার। ওর দিকে চেয়েই বাঁচবার সাধ আমার বেড়ে গেল।

নিজেকে ঘৃণা করিনি কখনো। করলে, নিজের কাছে নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট করা হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারানো মানেই তো আত্মহত্যা।

এই বিশ্বাসের জোরেই অনেক ভেবে চিন্তে একদিন দুপুরে আমাদের সেই বেনেপুকুরের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। কেঁদে লুটিয়ে পড়লাম মার পায়ের তলায়।

ক্ষমা কর মা আমায়। যা শাস্তি দিতে চাও দাও, আমায় ফিরিয়ে নাও।

মা ঝটকা মেরে পা সরিয়ে নিলেন। আমি ভ্রষ্টা, আমি কুলের কলংকিনী, আমাকে ছুঁলেও নাকি এখন জাত যাবে।

তুমি আমাদের মেয়ে নও। কেন ঐ পোড়া মুখ দেখাতে এলে ? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও কিছু করবার উপায় নেই। মা বললেন শেষে কাঁদতে কাঁদতে, তুমি মরে গেছ—এই কথাই সবাই জানে। তা না হলে, সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। বিয়ে হবে না ধীরার। বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও এখুনি। যা করেছ, আর আমাদের সর্বনাশ করো না।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফিরে এলাম।

বাড়িওয়ালার নোটিশ মত কালই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আমায়। সময় অত্যন্ত কম। মাত্র একটি রাত পার হলেই আমি হবো

আশ্রয়হারা, ঠিকানা হবে অজানা, নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়াতে হবে পথের ধুলোয়। আমি আজ একেবারে রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঠেলে ঠেলে চলতে হবে আমায়। তাই, সামনেকার এই দুর্দিনের হাত থেকে ভালভাবে বাঁচবার মত একটা পথের সন্ধান আপনার কাছ থেকে পাবো, সেই আশায় ভর করে এত দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসেছি। আপনি একটু ভেবে দেখবেন না আমার কথা ?

অন্তর দিয়ে একটা সুন্দর নীড় বাঁধতে চেয়েছিলাম সুধীরকে নিয়ে। তাই সারা অন্তর দিয়েই ভালবেসেছিলাম তাকে, ভালবেসেছিলাম আমাদের ক্ষুদ্র সংসারকে। যৌবনের কামনা বাসনাকে যৌবন দেবতার পায়ে ডালি দিতে চেয়েছিলাম হৃদয় দিয়ে, কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর ছেলেখেলায় আমার মাতৃত্বের গর্ব খর্ব হয়ে গেছে, সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় লুটোপুটি খেতে বসেছে।

ছোট্ট মেয়ে আমার মা বলে ডাকতে শিখেছে। এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছোট্ট শিশু। এর জন্যেই বাঁচতে হবে আমাকে।

আমার মন জানে, কোনো কুকাজ আমি করিনি, আমি নির্দোষ, সাচ্চাই আছি আমি বরাবর।

এই কচি শিশুটার জন্যে যদি পথই আমার একমাত্র আশ্রয় হয়, তার জন্যে আমি দুঃখ করবো না, পথে পথে ভিক্ষে করেই বাঁচিয়ে রাখবো আমার মেয়েকে। কিন্তু কথা হচ্ছে—অন্যায় না করেও মানুষ হয়ে মানুষের কাছে অবজ্ঞার বস্তু হয়ে বেঁচে থাকবো কি করে ? তাই আমার জিজ্ঞাসা, আজীবন এই দুঃসহ অবহেলার মর্মান্তিক জ্বালা নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো কেমন করে ?

অথচ আমাকে বাঁচতেই হবে।

তাই আমার বিনীত নিবেদন, সমাজের মধ্যে সম্মানের সংগে বাঁচবার মত একটা উপায় করে দিন আপনি।

অভাগিনী

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

# বসন্ত বাহার

ওস্তাদ তৈরীই ছিলেন। অনুপম আসতেই পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, চলো অনুপম, আজ তোমাকে বাজনা শোনাতে নিয়ে যাবো এক জায়গায়।

টালিগঞ্জের মূর এভিন্যু। সুরম্য উদ্যানে ঘেরা সুন্দর একখানি দ্বিতল বাড়ি। বাইরের ঘরে বসে ছিলেন বিশ্বনাথবাবু—ওস্তাদের এক ছাত্রীর বাবা। ওস্তাদ পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সংগে।

আমার ছাত্র অনুপম। বি. এস-সি তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। এম. এস-সি পড়ছে এখন। ভারী ভাল হাত এর বাজনায়।

ওস্তাদের সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে কণকলতা। দোহারা সুঠাম দেহে লাবণ্যের জোয়ার, পাতলা ঠোঁটে মোলায়েম হাসির প্রসন্ন ব্যঞ্জনা।

নমস্তে গুরুজী—

আও বেটি। ইয়ে অনুপম। আমার সাকরেদ। তোমার বাজনা শোনাতে নিয়ে এসেছি।

নমস্কার—

কণকলতা চাইলো অনুপমের দিকে। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, ঈষৎ লাজুক মুখখানি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

তারপর ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, গুরুজী আমি তো এখনো ভাল—

ওস্তাদের মুখখানি হাসিতে ভরে উঠলো। বললেন, যা শিখেছো তাই শোনাবে।

আপনাকেও বাজাতে হবে কিন্তু, অনুপমের দিকে চেয়ে এবার হাসলো কণকলতা। তার শ্যাম্পু-করা চুলের গুচ্ছ সযত্ন চর্চিত, কপালের উপর কয়েকগাছি কোঁকড়া চুলের এলোমেলো আনাগোনা।

বাজনা শোনার জন্তেই তো গুরুজী আমাকে এনেছেন। বাজাতে তো আসিনি আমি। বললো অনুপম।

আপত্তি টিকলো না।

বাজাতেই হোল অনুপমকে।

কণকলতার বাজনা ভারী মিষ্টি, কিন্তু তার সেই মিষ্টি হাতকেও ছাপিয়ে গেল অনুপমের হাতে সুরের আলাপ। তন্ময় হয়ে বসে বসে শুনলো সে। এত ভাল যে নটবেহাগ বাজাতে পারবে অনুপম তা ভাবতেও পারেনি।

আবার কবে আসছেন? চলে আসার সময় মুগ্ধ কণকলতা জিজ্ঞেস করলো অনুপমকে।

যেদিন গুরুজী নিয়ে আসবেন।

তারপর ওস্তাদের সংগে মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা চলতে লাগলো।

সম্প্রতি পড়াশুনোর চাপে এবং অসুস্থ্যতার জন্তে কিছুদিন যেতে পারেনি অনুপম।

একদিন কণকলতার একটুকরো চিঠি এলো তার কাছে। লিখছে অনুপমের সঙ্গে তার বিশেষ দরকার। একবার তার যাবার সময় হবে কি?

বারবার করে পড়বার পর ছোট্ট চিরকুটটি নিয়ে বেশ একচোট মাথা ঘামালো সে। তারপর যাবে কি যাবে না—এ নিয়েও একদফা চিন্তা

করলো। যদি একান্তই যেতে হয়, তাহলে কি আজই যাওয়া উচিত? কি জানি, অনুপম ভাবলো, যদি সত্যিই কোনো গুরুতর প্রয়োজন থাকে! কেন মিছিমিছি আজেবাজে কথা ভাবছে সে? অবশেষে সেই দিনই গেল সে।

দেখা হতেই প্রশ্ন করলো কণকলতা, গুরুজীর কাছে শুনলাম আপনার নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে? কেমন আছেন এখন?

এইটাই কি তোমার দরকারী কথা?

না।

তবে?

বিলেত যাচ্ছেন কবে বলুন তো?

চট্ করে এই আকস্মিক খাপছাড়া প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলো না অনুপম। অবশ্য মনে পড়লো তার, একদিন কথায় কথায় কণকলতাকে বলেছিল বটে সে বিলেত যাবে জানুআরীতে। কিন্তু সে তো কথার কথা! অর্থহীন অনেক কথাই তো বলতে হয় মানুষকে অনেক সময়, ভুলেও যায়। অনুপমও ভুলে গিয়েছিল সে কথা। কিন্তু কণকলতা ভোলেনি।

বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই অনুপম বললো, না, যাওয়া আর হোল না। পাসপোর্ট ভিসা হয়ে ওঠেনি কিনা।

বেশ হয়েছে।

কণকলতার কথা শুনে থমকে গেল অনুপম। বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ তুললো সে, আমার যাওয়া না হওয়ায় তুমি খুশি হলে কেন বলতো?

এবার ভ্রু কুঁচকে কণকলতা অনুপমের দিকে চাইলো, কেন লেখাপড়া করেন বলুন তো?

আর কিছু বলবার নেই, শুনবারো নেই। কিছুক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে অনুপম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো, আর সে এ মুখো হবে না। কি দরকার এভাবে রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়বার। এ নিয়ে আর মাথাও ঘামাতে যাবে না সে কখনো।

তারপর আরো কিছুদিন কেটেছে। ভুলে গেছে অনুপম সে সব প্রতিজ্ঞার কথা। আপনা থেকেই যেন পা দুটো চলে আসে ওদের বাড়িতে।

কণকলতাকে ঘরে না পেয়ে অনুপম বসে রইলো চেয়ারে। ঠিক করেছে, নিজে থেকে তাকে ডাকবে না আজ। হঠাৎ ঘরে ঢুকে চমকে যাক কণকলতা।

সামনের টেবিলে নক্সা করা চাইনীজ ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল। সমস্ত ঘরখানাই পরিচ্ছন্ন হাতের স্পর্শে মনোরম। এমনই থাকে সব সময়, বরাবর। কণকলতা শুধু নিজেকেই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে না—ঘরবাড়ি, আসবাব, এমন কি চাকরটাকে পর্যন্ত না সাজালে তার মন ভরে না। সেতারে মিষ্ট মধুর সুরসৃষ্টির মত তার জীবনের পরি-প্রেক্ষিতকেও সুন্দরতর করে মাধুর্যে ভরিয়ে রাখতে চায় সে সর্বক্ষণ। জীবনটাকেও সুরের মত মধুময় করতে চায় সে। তাই এ বাড়ির বৃদ্ধ পিতার একমাত্র আদুরে মেয়েটির হাতের পরশ পাওয়া যায় সব জিনিসে, সব ব্যবস্থার মধ্যেই। বসে বসে এই মেয়েটির কথাই ভাবছিল অনুপম, ভাবছিল কত সম্ভব অসম্ভবের কথা।

কতক্ষণ এসেছেন? ঘরে ঢুকলো কণকলতা।

এই কিছুক্ষণ, তুমি ছিলে কোথায়?

বাগানে।

ফুল তুলছিলে বুঝি?

না, ফুলগাছগুলো তুলিয়ে ফেলছিলাম।

কেন?

ভাল লাগে না বলে।

মানে!

দাঁড়ান চা নিয়ে আসছি। বলেই কণকলতা এড়িয়ে গেল জবাবটা। বেরিয়ে গেল মুখখানা আড়াল করে।

উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো অনুপম। দেখলো সুন্দর ফুলের বাগানটা সত্যিই বিলকুল সাফ হয়ে গেছে। নতুন নতুন ফুলের চারা বসানো হচ্ছে সেখানে।

নিন, চা খান। পেয়ালা হাতে এর মধ্যেই আবার ঘরে এসে ঢুকেছে কণকলতা। মুখটা না প্রফুল্ল না গম্ভীর। দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা।

ধরুন—পেয়ালাটা একেবারে অনুপমের হাতের কাছে এগিয়ে গেল।

ধূমায়িত পেয়ালার দিকে ভালভাবে চোখ পড়তেই না হেসে পারলো না অনুপম, দুধকে চা বলে চালানো ভাল নয়—বুঝলে?

হুঁ—বেশি চা খাওয়াও উচিত নয়, বুঝলেন? কণকলতা বললো, বসুন সেতারটা নিয়ে আসছি। বলেই ভিতরের দিকে চলে গেল সে ছন্দের লহরী তুলে।

দিন কাটতে লাগলো তাদের এমনি করেই। কিন্তু যতই দিন যায় ততই নানান চিন্তা এসে জড়ো হয় অনুপমের মাথায়। তার মধ্যে একজনের কথাই মনে পড়লো আজ। তাদের চপলতা টের পেয়ে ওস্তাদ একদিন তাকে বলেছিলেন সমঝে চলতে। কি লজ্জাই যে পেয়েছিল সেদিন। অনুপম বলেছিল, হ্যাঁ—সে মনে রাখবে ওস্তাদের কথা। কিন্তু, অনুপম ভাবলো, ওস্তাদের কথা তো সে রাখতে পারছে না।

অনেক ভেবে চিন্তে ওস্তাদের কাছে সবই খুলে বললো অনুপম। খুব খুশি হয়ে তিনি পিঠ চাপড়ে দিলেন, সেই সংগে দিলেন কয়েকটি উপদেশ।

তার পরদিন রেওয়াজের পর ওস্তাদ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ছাত্রীকে। প্রশ্নগুলির যথাযথ জবাব দিয়ে যখন কান্নায় ভেঙে পড়লো কণকলতা, তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিনি অনেক কথাই বোঝালেন। তারপর বললেন, বল্ বেটি—তুই আমায় কথা দে যে দিল থেকে ওসব মুছে ফেলে দিয়ে ঠিক বন্ধুর মত দেখবি তুই অনুপমকে, সহজভাবে মিশবি তার সংগে।

অতিকষ্টে কণকলতা বললো, কথা দিলাম গুরুজী।

তারপর রেওয়াজের আসর বসতে লাগলো ছাত্র-ছাত্রী দু'জনকে নিয়েই। এর আগেও বসেছেন দু'একদিন। এবার পুরোদমে চলতে লাগলো।

দিনের পর দিন ওদের তালিম দিয়ে চলেছেন ওস্তাদ।

কিন্তু পূর্বেকার সেই সহজ সচ্ছন্দ মেলামেশায় ভাটা পড়ে গেছে। দু'জনই গুরুজীর উপদেশমত প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সহজ হবার, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও দু'জনের মনের সুর নতুন খাতে নামাতে পারছে না। মিলতে পারছে না, মিশতে পারছে না জড়তা কাটিয়ে। কী এক দুর্লঙ্ঘ্য সংকোচে কেউই ঠিকমত তাকাতে পারছে না কারো দিকে।

সবই লক্ষ্য করে চলেছেন ওস্তাদ। কিন্তু তাই বলে রাগের সাধনা তো বন্ধ থাকতে পারে না। তিনি যে এদের দুজনেরই উপর এখন ভরসা রাখেন অনেকখানি। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনটিই যে এরা।

আজ বসন্তবাহারের পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন।

ওস্তাদ বসলেন সোজা হয়ে।

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে সহজ হবার জন্যেই অনুপম তাকালো কণকলতার দিকে। কি যেন বলতে গিয়েও আটকে গেল।

অনুপম না বলতে পারলেও, চা খাওয়ার পর কেন যে সে চাইলো তার দিকে, কণকলতা বুঝতে পেরেছে। অনুপমের বরাবরের অভ্যাস চা খাওয়ার পর একটি লবঙ্গ মুখে দেওয়া।

চট্ করে উঠে গিয়ে কয়েকটা লবঙ্গ নিয়ে এলো কণকলতা। নিন—। পাছে আগেকার মত হাতে হাতে ছোঁয়া লেগে যায়, তাই বেশ খানিকটা উঁচু থেকেই আলগোছে একটি লবঙ্গ ছেড়ে দিল সে অনুপমের বাড়িয়ে দেওয়া হাতের ওপর।

সাদা মোচের ফাঁকে একটু মুচকি হাসলেন ওস্তাদ।

এবার দু'জনই আপন আপন যন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কোলের উপর সেতার তুলে নিয়ে সুরের তারের সংগে তরফের তারের সুর মেলাতে গিয়ে দু'জনেই দেখলো, কারোটাই মিলছে না।

কানমলা চললো, চললো তারের উপর তর্জনী সঞ্চালনে সুরের মিল করার ব্যাপার। টুং টাং শেষ হলে, মুক্তোর ম্যান্কাটি এদিক ওদিক করে একবার দেখে নিয়ে ঠিক জায়গাটিতে বসিয়ে দিলো কণকলতা। সুর পরখ করা শেষ হোল।

এবার মেজরাব উঠলো দু'জনের হাতেই। গ্রহ-স্বর থেকে অঙ্গুলি চালনা শুরু হোল।

ওস্তাদ বললেন, নিচু হয়ে গেছে সুর। আর একটু চড়িয়ে নাও।

সুর চড়ানো হোল।

হ্যাঁ, হয়েছে। ঠিক সুরে বাঁধা হয়ে গেছে যন্ত্র।

শুরু হোল এবার স্বরের আলাপ।

উত্তরাঙ্গ প্রধান বসন্ত রাগ। গলতি করনা মৎ। হুঁসিয়ার করে দিলেন ওস্তাদ।

নানারকম ভাবে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ চলবার পর মধ্যস্থান থেকে তান ধরলো অনুপম :

সা মা পা মা গা মা ণ ধা নি সা

মন্দ্রস্থান থেকে জবাব দিলো কণকলতা :

পা মা পা গা মা ণ ধা নি সা

হাঁ-হাঁ। বাহবা দিলেন ওস্তাদ।

কেউ কারো চেয়ে কম যাচ্ছে না। একটা তান বাজিয়ে ন্যাস দিচ্ছে অনুপম, সংগে সংগে আর একটা তান ধরে' কণকলতা শেষ করে দিচ্ছে। একটার পর একটা করে এমনিভাবে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ চললো।

তারপর একবার তেহাই দিলো অনুপম।

মা ণ ধ ন স, মা ণ ধ ন স, মা ণ ধ ন স

বেশ তৎপরতার সঙ্গেই বাহাদুরী দেখিয়ে তেহাইয়ের জবাব দিলো কণকলতা।

মা ণ ধ ন স, মা ণ ধ ন স, মা ণ ধ ন স

আচ্ছা-আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ খুশি হয়ে উৎসাহিত করলেন।

আবার চললো সুরের আলাপ। তান ধরেছে কনকলতা। বাজাতে বাজাতেই অনুপমের দিকে আড়চোখে একবার চাইতে গিয়ে তান কেটে গেল তার, কিন্তু সংগে সংগেই আবার সামলে নিয়েছে সে, সামলে নিয়ে বেশ দক্ষতার সংগেই সে তানের ন্যাস দিলো। তখুনি অপর একটি তান ধরলো অনুপম। নিপুণ হাতে আলাপ করতে করতে একবার চোরাচোখে কনকলতাকে দেখে নেবার লোভ সামলাতে না পেরে তারও ভুল হয়ে গেল বাজনায়।

বিরক্তির সংগে লক্ষ্য করছেন ওস্তাদ। এ ওর দিকে মাঝে মাঝে না তাকিয়ে পারছে না। অথচ পরস্পর চোখোচোখিও হচ্ছে না। দু'জনেই মনে করেছে, ও আমাকে দেখছে না।

ঠিকসে বাজাও—ওস্তাদের কণ্ঠে গুরুগম্ভীর ধমকের সুর।

ওস্তাদের কত আশা ;—তাঁর ছাত্র-ছাত্রী নিখুঁতভাবে বোধন করবে বসন্তবাহারের। এই মিশ্র রাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে তারা।

তারপর! তারপর সমঝদার আদমীদের মজলিসে যখন ওরা বাজাবে একসংগে, তন্ময় হয়ে শুনবে সবাই, তারিফ করবে ওদের। বিমুগ্ধ শ্রোতারা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করবে, কার ছাত্র-ছাত্রী এরা? কোন্ ওস্তাদ এমন সুন্দর তালিম দিয়েছে এদের! যখন তারা জানবে যে, সে ওস্তাদ আর কেউ নয়, মহম্মদ সবিরুদ্দিন খাঁ—তখন? তখন ধন্য ধন্য পড়ে যাবে ওস্তাদের নামে। বুকখানা দশহাত ফুলে উঠবে তাঁর।

কিন্তু না, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। সুরের ভুল বরদাস্ত করতে পারেন না ওস্তাদ। রাগে গরগর করতে করতে কট্‌মট করে

তাকালেন ওদের দিকে। ওস্তাদের নীরব তিরস্কারে দু'জনেই আরো মনোযোগী হয়ে উঠলো।

ভয়ে ভয়ে যন্ত্রীরা সুরের আলাপ করতে লাগলো আবার। নির্ভুল এক একটা তান বাজিয়ে চলেছে ওরা।

অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে শোনার পর ওস্তাদের মনে খুশির সঞ্চার হচ্ছে আবার।

হ্যাঁ, জমছে। ধীরে ধীরে আবার জমে উঠছে আলাপ। উন্নত পর্যায়ের আলাপে এবার ছন্দ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, হচ্ছে সুন্দর রসসৃষ্টি। বিরহের করুণ রাগ মূর্ত হয়ে উঠতে আর বুঝি বেশি দেরী নেই। মিড়ের এক একটা মূর্ছিত ঝংকারে তন্ত্রী অবশ করে দিতে চায়। রহস্যাবৃত অন্তরলোকের নিগুঢ় বেদনা বুঝি থই থই করে উঠবে এখুনি।

হাঁ হাঁ ঠিক এমনটিই তো চাইছেন ওস্তাদ। এমনি নিপুণভাবে এগুতে পারলেই তো রাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, হবে ওস্তাদের পরিশ্রম সফল। শুনতে লাগলেন তিনি মন দিয়ে।

প্রশস্ত নীরব কক্ষের নিঃঝুম পরিবেশ সমৃদ্ধ সুরের পরশে স্তব্ধ হয়ে আছে। অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে সূক্ষ্ম সুরের রেশ।

আলাপ। আলাপের পর আলাপ।

তানের বৈচিত্র্যে বিলম্বিত আলাপ চলছে—

শুনতে শুনতে খুশিতে চোখ বুজে এল ওস্তাদের।

বিলম্বিত আলাপের পর জোড় বাজছে এখন।

মুগ্ধ হয়ে শুনছেন ওস্তাদ। চোখ বোজাই রয়েছে তেমনি ভাবে। মনের তালে তালে এবার ঘাড় দুলতে লাগলো তাঁর। আর বাজনার সাথে সাথে মুখ দিয়েও তান বেরুতে লাগলো ওস্তাদের :—

সা সা সা গা গা গা

সা সা সা মা মা মা

গা গা গা মা মা সা

কিন্তু একি ! হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন ওস্তাদ, এমন সুন্দর বাজাতে বাজাতে এমনভাবে রাগভ্রষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা ?

ফাঁদে-পড়া হরিণ-শিশুর মত ভীত শংকিত চাহনি, ঈষৎ অধোমুখ কণকলতার। আলাপ করতে করতে একটা গমক দিতে যাওয়ার সময় রাগভ্রষ্ট হয়েছে।

কড়াং কট্।

আর একবার চকিত হয়ে উঠলেন ওস্তাদ। শব্দ শুনেই তিনি বুঝেছেন কণকলতা রাগভ্রষ্ট হবার সংগে সংগে শুধরে নেবার জন্যে তান ধরেছিল অনুপম—সা সা সা মা মা

কিন্তু খুব দ্রুত লয়ে বাজাতে গিয়ে সর্বনাশ হয়ে গেছে, তার ছিঁড়ে গেছে অনুপমের হাতের।

হায়-হায়-হায় ! আর মাত্র সামান্য একটুক্ষণ বাজাতে পারলেই যে পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যেত বসন্তবাহারের। আফ্‌সোসে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। কিন্তু আফ্‌সোস করলে তো চলবে না—এদের মধ্যেই যে ওস্তাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে চান।

তিনি চাইলেন ওদের দিকে। ভয় সংকোচ ও লজ্জায় দু'জনই কুঁকড়ে গেছে একেবারে। ক্ষমাপ্রার্থীর ভীরু দৃষ্টিতে দু'জনই চাইছে তাঁর দিকে।

ফিন পহ্‌লেসে শুরু করো। রাগতকণ্ঠে ওস্তাদ হুকুম করলেন।

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো কণকলতা।

অনুপম নীরবে মাথা নিচু করলো।

ওস্তাদ একটু চিন্তা করেই বুঝলেন, হুকুম করে বা ভয় দেখিয়ে এদের দিয়ে আর কাজ হাসিল হবে না। তিনি বললেন, ঠিকসে বয়ঠো তুমলোগ, বাচপানি কা বদলি দোস্তী বানাহ্‌ লেও।

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়লো।

রুদ্ধ অভিমানে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে কনকলতার। না-না, পারবে না। কিছুতেই সে এখন সহজ হতে পারবে না। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফোঁপাতে থাকে কনকলতা।

আর অনুপম ?

তার ছিঁড়ে গেছে তার যন্ত্রের। কেমন করে সেই বিকল যন্ত্রে আবার পুরনো আলাপ জমাবে বুঝে উঠতে পারছে না। অন্তরের দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠেছে সেও।

না-না-না। দ্বিধা সংকোচ তোমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে। ওস্তাদ গম্ভীরসে বললেন, সহজভাবে তাকাও পরস্পরের দিকে।

অসম্ভব। কেউ কারো দিকে তাকালো না। দু'জনেই অধোমুখ। কপোত বুকের ওঠানামায় থরো থরো কাঁপুনি।

নীরব হেসে বললেন ওস্তাদ, ছেঁড়া তার জোড়া দিতেই হবে।

উঃ, কি সাংঘাতিক। মানুষের এমন চরম ক্ষণেও কি কেউ কাউকে আঘাত দিতে পারে! দু'জনেই মনে মনে ওস্তাদের কথায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো।

পাগলি কাহেকা, কণকলতার গায়ে হাত রাখলেন ওস্তাদ, তোদের মনের তার জুড়তে পারবি না ?

সত্যিই অসহ্য। বেদনায় ফেটে পড়ছে কণকলতা। আর এ কী খেলা খেলছেন ওস্তাদ তাদের নিয়ে। ঠাট্টা মস্করারও তো একটা

সীমা আছে ! হোলই বা গুরুজী। ঝটকা মেরে নিজেকে তাঁর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে বাঁচতে চাইলো সে।

অমনি খপ্ করে কণকলতার হাতখানা চেপে ধরলেন ওস্তাদ, আমাকে একিন করতে পারছিস না, না মা ? গুরুজীর অপরূপ মোলায়েম কণ্ঠে এবার চমকে তাকালো কণকলতা।

না মা, সাচ্ বাত, আমি ঠাট্টা করছি না। তুমিও শোনো অনুপম, আমি বোকা নই। তোমাদের মনের তার জুড়ে দেবোই। ওস্তাদ দরদভরা কণ্ঠে বললেন যুগের হাওয়া পালটে গেছে। কালের সংগে পাল্লা দিয়ে না চলতে পারলে, আমরা যে জোয়ানদের কাছে অবহেলার বস্তু হয়েই থাকবো। ওস্তাদ বলে চললেন, তোমাদের সবই লক্ষ্য করেছি আমি। লক্ষ্য করে করে বুঝতে পেরেছি যে তোমরা একে অন্যকে ছাড়া জীবন সুন্দর করে তুলতে পারবে না। জীবন আর জগতের সম্বন্ধ তো অবিচ্ছিন্ন। এই জীবন আর জগতকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে যে মিলিত প্রাণের প্রেরণারই প্রয়োজন।

যেদিনই সেটা বুঝতে পারলাম—বুঝ্‌লে মা—এবার কণকলতার দিকে ফিরে বললেন, সেদিনই আমি অনুপমের অভিভাবকদের সংগে কথা কয়েছি। তাঁরা এ ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার বাবার সংগেও কথা বলে বুঝেছি, এত খুশি আর তিনি কিছুতেই হবেন না। এখন যে বিকল যন্ত্র সচল করে দিয়ে তোমাদের জীবনে বসন্তের বাহার আনতে হবে আমাকেই। আমি তাহলে আসি এখন। আমার যে অনেক কাজ। বলেই অনুপম আর কণকলতাকে একসংগে অবাক করে দিয়ে উঠে পড়লেন ওস্তাদ।

ওস্তাদ চলে গেলেও ওরা তেমনি চুপচাপ বসে রইলো। মনের ভারটা অনেক লঘু হয়ে গেছে এখন। অনেক—অনেক। কিন্তু চরম

বেদনায়ও যেমন কেউ কারো দিকে প্রাণখুলে চাইতে পারেনি এতদিন, পরম আনন্দক্ষণে আজ শত চেষ্টা করেও কেউ কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না।